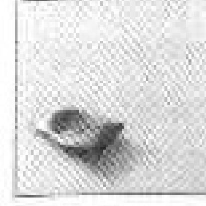
হৃদিতা

আনিসুল হক



কবিরের কথা

আজ আমার সঙ্গে একটা মেয়ের পরিচয় ঘটেছে। মেয়েটার নামটা মনে রাখবার মতো। হৃদিতা। পরিচয়টা ঘটল পুরোপুরি আকস্মিকভাবে এবং বলা যায়, নাটকীয়ভাবে। *শেষের কবিতা*-র অমিত আর লাবণ্যের মধ্যে যেভাবে দেখা হয়েছিল, ঘটনা অনেকটাই সে-রকম। আপনারা আবার ভেবে বসবেন না যে আমি নিজেকে অমিতের সঙ্গে তুলনা করতে যাচ্ছি। না, আমি কবির, কবিরুল ইসলাম, আমি যা, আমি তাই। তবে হৃদিতার সঙ্গে লাবণ্যের মিল থাকলেও থাকতে পারে। জানি না। আপাতত, বিছানায় শুয়ে, দিবানিদ্রার বদলে যখন দেখতে শুরু করেছি দিবাস্বপ্ন, চোখের সামনে বার-বার ভেসে উঠছে তার মুখটা, বুদ্ধিতে ঝিকমিকিয়ে ওঠা চোখ দুটো, তখন মনে হচ্ছে হৃদিতার মতো মেয়ে এই পৃথিবীতে আর একটাও নেই, আর কোনোদিন আসবেও না। এ পৃথিবী একবারই পেয়েছিল তাকে, কোনোদিন পাবে না আবার। আমিও আর তার দেখা কোনোদিনও পাব না। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুকের একবারে ভেতর থেকে, বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে তাকিয়ে রইলাম জানালার দিকে, জানালার কাছে এসে পড়া কামিনী গাছের ছোট ছোট পাতার দিকে।

আজ ছিল শিল্পকলা একাডেমিতে দ্বিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীর কাগজপত্র জমা দেবার শেষ দিন। ড্রাইভার আজকে ছুটিতে ছিল বলে আমি নিজেই ড্রাইভ করছিলাম। কাগজপত্র জমা দিয়ে ফিরছিলাম রমনা পার্কের ধার দিয়ে, শেরাটনের পাশ দিয়ে। আজকের সকালটা ছিল উজ্জ্বল।

কার্তিক মাস, হেমন্তকাল। ঢাকা শহরে রাতটা এখনও গরম, তবে ভোরবেলায় ঠাণ্ডা পড়ে। খুব ভোরে বাইরে বেরুলে দেখা যায় ঘাসে ঘাসে শিশির। গাছগাছালির ওপরে কুয়াশা থমকে থাকে।

শীতকাল আসছে, রোদের মধ্যে শীতকালের গন্ধটা আমি টের পাই। বাতাসেও এক ধরনের চনমনে ভাব। আজকের সকালটা ছিল একবারে কমলা রঙের রোদে ঝকমকে। গাড়ি বের করার আগে আমি একবার আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম, আকাশের নীলটাকে আমার মনে হয়েছিল কোবাল্ট ব্লু, এত নীল ছিল আজকের আকাশ।

হোটেল সোনার গাঁর মোড়ে ছিল প্রচণ্ড যানজট। অমন ভিড়ের মধ্যে একটা বেবিট্যাক্সি আমার পাশে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া আর শব্দ ওগড়াচ্ছিল। চারদিকে গাড়ি, বাস, টেম্পো, বেবিট্যাক্সি গিজগিজ করছে, গড়গড় করছে– এত ধোঁয়া যে আজকের সুন্দর দিনটা এখানে ধূসর হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল। আরেকটু দূরের যানজটের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়াচ্ছন্ন রাস্তা দেখে এমন মনে হচ্ছিল যে, বোধ হয় জায়গাটায় আগুন লেগে গেছে। আমার পাশের বেবিট্যাক্সিটিতে কমলা রঙের জামা পরা একটা মেয়ে ছিল, কমলা রঙের কাপড় বলেই পুরুষের ইন্দ্রিয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘোষণা করছিল যে আরোহিণী একজন নারী, আমি তার মুখ কোনোদিনও দেখতে পাব না ভেবে কবিত্ব করে আফসোস করছিলাম, মনে হচ্ছিল সুনীলের কবিতা, বাসের অমন ভিড়ের মধ্যে মেয়েটা আমাকে এক লাইন কবিতা দিয়ে বেলগাছিয়ায় নেমে গেল নম্র নেত্রপাতে... তোমার হাতে গোলাপ তুমি ফুলের কাছে ঋণী রইলে, তোমার হাতে গোলাপ তুমি আমার কাছে ঋণী রইলে... সুনীল তো তবু এক লাইন কবিতা পেয়েছিলেন, আর এ মেয়ে কি আমাকে আধা লাইন কবিতাও দেবে না? আমি রিয়ার ভিউ মিররে খুঁজছিলাম তার মুখখানি, সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, বেবিট্যাক্সিটা আমাকে অতিক্রম করে সামনে চলে গিয়েছিল। বেশ খানিকক্ষণ সোনার গাঁর মোড়ের যানজটে আটকে থেকে পান্থপথে উঠতে পেরেছিলাম।

পান্থপথের জাহাজের ফার্নিচারের দোকানগুলোর সামনে তখন আমার গাড়ি। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা বেবিট্যাক্সি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে হলো এটা হলো সেই কমলাবাহী যান। আমি গাড়ি স্লো করলাম।

স্কুটারওয়ালা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর আরো একজন লোক ডেকে আরোহিণীকে নামানোর চেষ্টা করছে। আমি দেখলাম কমলা-রং নারীটিকেই তারা ধরাধরি করে নামাচ্ছে। আমি গাড়ি বাঁয়ে দাঁড় করালাম। তারা তাকে ফার্নিচারের দোকানের সামনে বিক্রির জন্যে রাখা একটা সোফায় শুইয়ে দিল। আমি স্টার্ট বন্ধ করে গাড়ির দরজা লাগিয়ে এগিয়ে গেলাম অকুস্থলে। আমার বাম হাতে গাড়ির চাবি।

সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললাম (চাবি ঘোরানোটা ইচ্ছাকৃত। যাতে তারা আমাকে একজন কেউকেটা মনে করে এবং কোনো অসদুদ্দেশ্য থাকলে ভড়কে যায়), 'কী হয়েছে? এই বেবিওয়ালা হয়েছে কী?'

বেবিওয়ালা খুবই অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'মনে হয় ফিট হইয়া পইড়া গেছে।'

'কেমন করে হলো?'

'ধপ কইরা শব্দ হইল। পিছন ফিইরা তাকায়া দেখি পইড়া আছে। মনে হয় রডের সাথে বাড়ি খাইছে। হার্ড ব্রেক করছিলাম তো।'

আমার খুব খারাপ লাগতে শুরু করল। রাস্তাঘাটে চলাচল করাটা সত্যি ইদানীং খুব বিপজ্জনক। আমরা যে কেউ এভাবে রাস্তার ধারে যে কোনো সময় পড়ে থাকতে

পারি, হয়ে পড়তে পারি একই রকম অসহায়। আমি মেয়েটার মুখের দিকে তাকালাম, এ তো দেখছি রীতিমতো সুন্দরী। তার বেশভূষা বলে দিচ্ছে সে ভালো ঘরের মেয়ে। বয়স মনে হচ্ছে কম, তাকে বলা যায় একজন সম্পূর্ণ তরুণী। ঈদসংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পূর্ণ উপন্যাসের মতো। সম্পূর্ণ উপন্যাস, কিন্তু স্লিম, সহজ, অগভীর, পৃষ্ঠাসংখ্যা কম। আমার বুক কেঁপে উঠল। ইতিমধ্যে ভিড় জমে উঠেছে। তাদের মধ্যে এক্সপার্ট পাওয়া গেল একাধিক জনকে। একজন বলল, মিরগি হইছে, জুতা শুঁকাইতে হইব। সুকতলি দরকার।

এখানে উপস্থিত মাত্র একজন লোকের পায়েই এমন জুতা আছে, যাতে সুকতলি বা সুখতলা থাকতে পারে। সে হলো এই হতভাগা।

বিশেষজ্ঞটি বলল, 'ভাইজান জুতাটা খুইলা সুকতলিটা একটু বাইর করেন তো দেখি তাড়াতাড়ি। আইচ্ছা এক কাজ করবার পারেন। আপনের মুজায় যদি গন্ধ থাকে, তাইলে একটা মুজা খুইলা দেন।'

আমি ইতস্তত করছি। সে বলল, 'কী ভাই মুজায় গন্দ নাই?'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'গন্ধ নাই, সুগন্ধ থাকতে পারে।'

'কন কী? ভাইজান কি আতর খান নাকি?'

একটা টোকাই চিৎকার করে উঠল, 'আতর খায়, আতর হা...'

কী মুশকিল।

আমাকে উদ্ধার করলেন আরেকজন। তিনি বললেন, 'মনে হয় ধুতুরা বিষ কেইস হইতে পারে। তাইলে কিন্তু বাঁচন-মরণ সমস্যা।'

আমি বেবিওয়ালাকে বললাম, 'যান তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান।'

বেবিওয়ালা বলল, 'আমি একলা অহন কেমনে লই।'

একজন বলল, 'ভাইজান আপনে লইয়া যান না গাড়ি কইরা।'

আমি থতমত। 'জি?'

লোকটা বলল, 'মানে, গাড়ি আপনের না?'

'হ্যাঁ।'

'তাইলে গাড়ি কইরা লেডিসরে তো আপনেয় হাসপাতালে নিয়া যাইতে পারেন।'

আমি ইতস্তত করছিলাম। কিন্তু উপস্থিত জনতা এ-মতেই মত দিল। আমি চ্চু, *আচ্ছা ধরেন দেখি* বলে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিলাম। সম্ভবত সে তরুণী আর সুন্দরী হওয়ায় এ দায়িত্ব পালন করতে আমি রাজি হয়েছিলাম।

আর তখন মেয়েটিকে বাঁচানোর ব্যাপারে আমি এত বেশি চিন্তিত ছিলাম যে অন্য কোনো ঝামেলার কথা আমার মনেও ছিল না। তবু গাড়িতে ওঠার আগে আমি মানিব্যাগ বের করে একটা টুকরো কাগজে অটোরিকশাওয়ালার নাম আর গাড়ির নম্বর টুকে নিয়েছিলাম।

তারা আবার ধরাধরি করে তাকে আমার গাড়ির পেছনের সিটে শুইয়ে দিল।

আমি গাড়ি চালিয়ে অদূরবর্তী একটা হাসপাতালে ঢুকে পড়লাম। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে, এখন চিন্তা করলে, অপার্থিব বলে মনে হয়। আমি কী একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে কোনো প্রশ্ন না তুলেই এ কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দিকে নির্দেশ করা তীরচিহ্ন দেখে দেখে আমি এগুতে লাগলাম। জরুরি বিভাগের গেটে এসে দৌড়ে ঢুকে গেলাম ভেতরে। রিসেপশনের সামনে গিয়ে আমি চিৎকার চেঁচামেচি করে বলতে লাগলাম, রোগী এনেছি, ইমার্জেন্সি কেস, ভাই কে আছেন আসেন একটু ধরতে হবে। স্ট্রেচার নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি আসেন। রিসেপশনের মহিলাটি কী একটা কাগজ দেখছিল, সে আমার চিৎকার শুনে বলল, সামাদ বাই, দেখেন তো রোগী নামাতে হবে, নাছের বাইরে নিয়া একটু ধরেন। স্ট্রেচার সমেত দুজনকে পাওয়া গেল। তারা চলছে তাদের গতিতে, আর আমি আছি গতিজড়তায়। আমার মনে হচ্ছে তারা নড়ছে না, অথবা এটাকেই বলা হয় শম্বুকগতি। গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিলাম। তারা দক্ষ লোক, রোগী হরদমই ভেতরে-বাইরে নিচ্ছে, তরুণীটিকে তারা গাড়ি থেকে নামিয়ে স্ট্রেচারে তুলে নিল। আমি তাদের পেছন পেছন চললাম ইমার্জেন্সির ভেতরে।

তাকে শোওয়ানো হলো একটা উঁচু ধরনের লোহার পা-ওয়ালা বেডে।

ডিউটি ডাক্তার গিয়েছিলেন ক্যান্টিনে চা খেতে। ইন্টার-কমে তাকে খবর দেওয়া হলো। তিনি একটা পান চিবুতে চিবুতে এলেন। আমার তখন খুবই অসহ্য লাগছিল। এরা এত স্লো কেন? ব্যাংককের হাসপাতালে তো এমন নয়। ওখানে কোনোমতে রোগী পৌঁছে দিতে পারলে বাকি সব দায়িত্ব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। তারা রোগীকে গোসল করিয়ে দেয়, শেভ করিয়ে দেয় পর্যন্ত। বেডের নিচে রাখা গামলায় পানের পিক ফেলে ডাক্তার সাহেব বললেন, রোগী কার?

আমার বুকটা ধড়াক করে উঠল। এই রোগী কি আমার?

আমি বললাম, 'জি আমি...মানে...'

'কী হয়েছে?'

'আমি ঠিক জানি না। বেবিট্যাক্সিতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেন্সলেস হয়ে যান। আমি গাড়ি করে যাচ্ছিলাম। তাই ওনাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়াটা কর্তব্য মনে করে...

'পেসেন্ট আপনার কে হয়?'

'কেউ হয় না। বললাম না রাস্তায় দেখি...'

'পেসেন্টের নাম কী?'

'তা তো জানি না।'

'রেজিস্টারে তো ওনার নাম লাগবে। এই ব্রাদার ব্রাদার এই ভদ্রলোককে বসতে দেন। আমি না বলা পর্যন্ত যেন উনি না যায়। শোনেন, আপনার নাম যেন কী?'

'কবিরুল ইসলাম।'

'কবিরুল ইসলাম সাহেব, পেসেন্টের জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত আপনি যাবেন না।'

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। বাসায় মা একা একা আমার জন্যে চিন্তায় অস্থির হয়ে যাবেন। সাদা ইউনিফর্ম পরা একজন লোক, তিনি ব্রাদারই হবেন, আমাকে বললেন, 'আসেন।'

আমি ডাক্তার সাহেবকে বললাম, 'দেখেন আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। একজন রোগীকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে পৌঁছে দিয়েছি। বাকি রেসপন্সিবিলিটি আপনার। আমার একটু তাড়া আছে। আমাকে যেতে হবে।'

ডাক্তার সাহেব রোগিনীর পালস দেখছিলেন। তিনি মুখ না তুলে বললেন, 'শোনেন। এভাবে সেন্সলেস পেসেন্ট ফেলে রেখে চলে যাবার নিয়ম নাই। পরে খুব ঝামেলা হয়।'

'ঝামেলা মানে?'

'পুলিশ খুব যন্ত্রণা করে। অনেক সময় ক্রিমিনালরা ক্রাইম করে হাসপাতালে পেসেন্ট রেখে চলে যায়।'

সর্বনাশ। এর মধ্যে আবার পুলিশ আসছে কোত্থেকে?

'আমি তো গাড়িটা পর্যন্ত পার্ক করি নি ঠিকভাবে।'

'করে আসেন। ব্রাদার ওনাকে হেল্প করেন।' ডাক্তার চোখ টিপলেন। এর মানে কী, আমি তখন তখনই বুঝতে পারি নি বটে, কিন্তু এখন বুঝি, আসলে তিনি ব্রাদারকে বলছিলেন আমাকে চোখে চোখে রাখতে। এটাকেই বোধহয় বলা যায় নজরবন্দি।

আমি গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি পার্ক করে রাখলাম যথাস্থানে। তারপর চিন্তিত ব্রাদারের সাথে গিয়ে বসলাম একটা ওয়েটিং রুমে।

মাকে একটা ফোন করা দরকার। হাসপাতাল থেকে ফোন করা যাবে কিনা দেখা দরকার।

'ভাই টেলিফোন করা যাবে?'

ব্রাদার বললেন, 'কই করবেন?'

'বাসায়। বাসায় খুব চিন্তা করবে।'

'আসেন। ৫ টাকা ৩ মিনিট।'

রিসেপশনে গিয়ে দেখা গেল ফোন এনগেজ্‌ড। আরেক ব্রাদার ফোনে কথা বলছেন। তার টেলিফোনালাপটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার কানে এল এবং কানে পৌঁছা-মাত্রই সারা শরীরে খবর হয়ে গেল।

'হ্যালো, ওসি সাহেব আছেন? নাই? আছে? ওনাকে দেন। হ্যালো আমি... হসপিটাল থাইকা বলতেছি, এখানে ফোর্স পাঠায়ে দিতে হবে, আর্জেন্ট, এক লোক এক যুবতী মহিলারে অজ্ঞান কইরা ফেলায়া যাইতেছিল, আমরা আটকায়া রাখছি, তাড়াতাড়ি করেন, হ্যাঁ ওই টেম্পুটারে পাঠায়ে দেন, কতক্ষণ আটকায়া রাখা যায়, বোঝেন না, সন্ত্রাসী কেস। পরে গ্যাঞ্জাম হইব।'

উফ্‌! এই ছিল কপালে। আমার নিজেকে বড় ক্লান্ত বলে মনে হলো। এই জন্যে লোকে বলে উপকারীকে বাঘে খায়। সেধে মানুষের উপকার করতে নেই। তবে

ডাক্তারের একটা কথায় কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা খোঁজা যেতে পারে। পেসেন্টের জ্ঞান হলে আমি চলে যেতে পারব। আমার এখন একটাই প্রার্থনা তার জ্ঞানটা তাড়াতাড়ি ফিরুক। জ্ঞান। ফিরুক তাড়াতাড়ি। জ্ঞান। নলেজ। নলেজ ইজ পাওয়ার। জ্ঞানই শক্তি। তার জ্ঞান তাকে শক্তি দিক। আমাকে দিক মুক্তি। তাতে আমার যাওয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞাও উঠে যায়, আবার এ রকম একটা সুন্দর তরুণীর সঙ্গে পরিচিত হবার একটা সুযোগ আমি পেয়ে যাই।

অপারেটরকে নম্বর দিতে হলো। তিনিই ডায়াল করে দিলেন। প্রথম প্রথম লাইন পাওয়া যাচ্ছিল না। বারবার রিডায়াল চাপছেন অপারেটর মহিলা। ফোনের স্পিকার অন করা আছে। রিং হচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি রিসিভার কানে ধরলাম। অপারেটর কানে ধরলেন একটা খবরের কাগজের ছিন্ন অংশ গোল করে বানানো কানের কাঠি। তিনি কান চুলকাচ্ছেন।

'হ্যালো মা। কবির।'

'কী বুড়ো, তুই কোথায়?'

'এই তো শিল্পকলায়। মা, আমার আসতে একটু দেরি হবে।'

'দেখ বাবা, তাড়াতাড়ি আয়। দেরি করিস না।'

'আচ্ছা।'

ফোন রেখে ৫ টাকার নোট খুঁজলাম। ছিল একটা, এখন খুঁজে পাচ্ছি না। দশটাকা আছে। দিলাম। ৫ টাকা ফেরৎ পাবার কথা। মহিলা কান চুলকাচ্ছেন। এ অবস্থায় কি ৫ টাকা ফেরৎ চাওয়া উচিত? সঙ্গত?

তার চেয়ে আবার ফোন করি। টাকাটার সদ্ব্যবহার হবে। বললাম, আবার দেন নম্বরটা। জরুরি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। অপারেটর ভাবলেশহীন মুখে আবার রিডায়াল চাপলেন। আমি আবার ফোনের রিসিভার কানে ধরলাম। তিনি কানে ধরলেন তার বাঁহাতের কানি আঙুল।

'হ্যালো মা। তুমি কিন্তু দুপুরে খেয়ে নেবে। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না।'

'কেন? এত দেরি হবে।'

'জানি না। যদি হয় তবে অবশ্যই দেড়টার মধ্যে খেতে বসে যাবে, বুঝেছ?'

কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, জানি না। ওয়েটিং রুমে ওয়েট করছি। সামনের বারান্দায় ব্রাদার পায়চারি করছেন আর আমাকে পাহারা দিচ্ছেন। আচ্ছা এদেরকে সবাই ব্রাদার বলে কেন? তারা সবার সেবা করে বলে? সব মানুষ ভাই ভাই এ মতে তারা বিশ্বাসী বলে? সেটা এক সময় ছিল। এখন তো আর নেই। তাহলে এরা আর ব্রাদার নেই। তবু তাদের ব্রাদার বলতে হবে। আইনত। তারা আইনের ব্রাদার। ব্রাদার ইন ল। শালা। এই নিয়ম করলে কিন্তু বেশ হতো। তাদেরকে শালা বা দুলাভাই বা বেয়াই বলে ডাকত সবাই। নিয়ম থাকলে নিশ্চয় বলত। স্কুলের বাচ্চারা তাদের

শিক্ষিকাদের মিস বলে। এটাই নিয়ম বলে বলে। অসুবিধা হয় না তো! মিস বিয়ে করে মিসেস হলেও অসুবিধা হয় না।

এমন সময় পুলিশের ওয়াকি-টকির যান্ত্রিক কথোপকথন শুনতে পেলাম। ওয়েটিং রুমের দরজায় খাকি প্যান্ট নীল শার্ট পুলিশের উপস্থিতি চোখে পড়ল। আল্লাহ জানে কপালে আরো কী কী আছে।

পুলিশ জুতায় খটখট শব্দ তুলে ওয়েটিং রুমে ঢুকে পড়ল। মনে হয় অফিসার। সঙ্গে ভাই-বেরাদার। কেয়ামতের দিন ভাইবেরাদার কেউ সঙ্গে যাবে না। পুলিশ কেসে ব্রাদারকে পাশে পাওয়া গেল। পুলিশ অফিসার বললেন, কই উনি কই?

ব্রাদার বললেন, এই যে উনি।

পুলিশ অফিসারটি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি পেশাদার খুনি। তারপর হাতের ওয়াকি-টকিটা এমন ভাবে এক হাত থেকে আরেক হাতে নিয়ে চোখ পাকালেন যে, তাতে আমি মনে মনে স্বীকার করে নিলাম, খালি খুন নয়, রেইপ ফলোড বাই মার্ডার।

'আপনার নাম?' তিনি জানতে চাইলেন।

খুব কমন প্রশ্ন। এর জবাব আমার জানা।

আমি আস্থার সঙ্গে জবাব দিলাম, কবিরুল ইসলাম।

তিনি আমার আস্থা ভেঙে দিয়ে বললেন, মোহাম্মাদ নাই? নামের আগে মোহাম্মদ নাই?

বললাম, 'সার্টিফিকেটে আছে। ম-এ ও-কার, তারপর বিসর্গ। এখন আর ব্যবহার করি না।' শালা কমন প্রশ্নেও ভুল উত্তর দিলাম। আজ কপালে অনেক দুঃখ আছে। মিনিমাম ১৮ ঘা।

'করেন কী?'

'পেইন্টার।'

পুলিশ অফিসার মনে হলো বুঝতে পারলেন না। আমার মুখের দিকে তাকালেন ভ্রূ-কোঁচকানো প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে। এই কমন প্রশ্নেও ধরা খাওয়া ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি বললাম, 'ছবি আঁকি।'

'মহিলা আপনার কে হন?'

'কেউ হন না। আমি রাস্তা দিয়ে আমার গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। দেখি একটা কুটারে সেন্সলেস হয়ে পড়ে আছেন। দায়িত্ব মনে করে তাকে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম আর কী? দেখেন তো কী ঝামেলা...'

'আরে না। ঝামেলা ভাববেন না। একজন মহিলা রাস্তায় একসিডেন্ট করে পড়ে থাকলে তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া ভদ্রলোকের কর্তব্য। কিন্তু আমাদেরও কর্তব্য আছে। আপনাকে আরো খানিক্ষণ থাকতে হবে।'

'কতোক্ষণ?'

'এই তো ওনার জ্ঞান ফিরলেই ...'

'আর যদি জ্ঞান না ফেরে...'

'তাহলে তো মুশকিল...দোয়া করেন যেন জ্ঞান ফেরে...তা না হলে পেসেন্টের আত্মীয়স্বজন না আসা পর্যন্ত আপনি কাইন্ডলি যদি আমাদের জিম্মায় থাকেন...

আমি আঁতকে উঠলাম তার কথা শুনে– 'কী বলছেন এসব? আমার তো ভীষণ জরুরি কাজ পড়ে আছে। আর শোনেন আমি বেবিট্যাক্সিটার নম্বর আর ড্রাইভারের নাম-ধাম টুকে এনেছি।'

'গুড। দেন দেখি কোথায় টুকে আনছেন।'

আমি তাকে মানি-ব্যাগ খুলে কাগজের টুকরাটা দিলাম। তিনি সেটা গ্রহণ করলেন গভীর সন্দেহের সাথে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি ভাবছেন, শালা, বউ মেরে আটঘাট বেঁধে নেমেছে। আবার একটা ফল্‌স কাগজও রেডি।

তিনি অয়্যারলেসে বার্তা পাঠালেন। তাতে বেবিওয়ালার নাম-নম্বর সব বলে দিলেন অন্য প্রান্তকে।

তারপর আমাকে বললেন, 'বেশি জরুরি কাজ থাকলে আপনি আপনার নাম-ঠিকানা সব থানায় এন্ট্রি করে রেখে চলে যেতে পারেন। কিন্তু একজন গ্যারান্টার লাগবে যে আপনার নাম ঠিকানা একুরেট দিছেন। একটা কাজ করতে পারেন। আপনার কাছে কোনো আইডি কার্ড আছে।'

'ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে।'

'না, ড্রাইভিং লাইসেন্স বেশির ভাগই ভুয়া হয়।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে আমি আরো কিছুক্ষণ থাকি। আপনারা বরং ওই মহিলার নাম-ঠিকানা বের করতে পারেন কিনা দেখেন। ওনার ফ্যামিলিতে একটা খবর দেওয়া দরকার।'

পুলিশ অফিসার হাসলেন। সে হাসি দেখে মনে হলো, উনি ভাবছেন, ঘাগু মাল। এক্টিং করতেছে।

আমার কিন্তু মনের ভাবটা এই, আর একটু অপেক্ষা করলেই যদি ওনার জ্ঞান ফিরে আসে, ক্ষতি কী?

ঠিক এ-সময় একজন নার্স এসে বলল, 'আপনার পেসেন্টের সেন্স ফিরেছে। আপনারা আসেন।'

আমার পেসেন্ট? দিস পেসেন্ট বিলংস টু মি!

আমরা উঠে পড়লাম। সামনে নার্স, তার পেছনে আমি, ব্রাদার আর দুজন পুলিশ। যাওয়ার পথে বাইরে দেখতে পেলাম, একটা টেম্পো। তাতে আরো ক'জন পুলিশ বসা। পুলিশ তাহলে টেম্পো নিয়েই এসেছে।

আমরা ওয়ার্ডে ঢুকে পড়লাম। ডক্টর'স কর্নারে ডাক্তারের সাথে দেখা হলো। তিনি বললেন, গুড নিউজ, পেসেন্টের সেন্স ফিরে এসেছে।

বললাম, 'বাঁচা গেল। এবার কি আমি যেতে পারি?'

পুলিশ অফিসার বললেন, 'যেতে তো আপনি সব সময়ই পারেন। আগেও পারতেন। তবু যদি আরেকটু থাকতেন।

বেবিওয়ালারা আজকাল খারাপও হয়। হাইজ্যাক টাইজ্যাক করে। মহিলার কিছু খোয়া গেছে কিনা দেখা দরকার...

আমাদের রোগিনীর বেডের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। চোখ খোলা। অর্থাৎ কিনা সত্যি সত্যি জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞানই শক্তি।

ডাক্তার তার কাছে গিয়ে বললেন, 'কী, এখন কেমন লাগছে?'

তিনি বললেন, 'ভালো। এখন কিন্তু আমি বাসায় যেতে পারব...'

ডাক্তার বললেন, 'আপনি যদি একটু ঘটনাটা বলতেন, কী করে কী হলো?'

তিনি বললেন, 'জানেন আমার কিচ্ছু মনে নেই। শুধু মনে পড়ে স্কুটারের ভেতরেই খুব চোখ জ্বালা করছিল। মাথা ঘুরছিল। এমন ধোঁয়া। তারপর হঠাৎ এমন ব্রেক কষেছে আমি ছিটকে সামনে পড়ে গেলাম। তারপর মনে হয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি... আচ্ছা আমাকে এখানে আনলো কে?'

ডাক্তার বললেন, 'এক ভদ্রলোক তার গাড়িতে করে এনেছেন।'

'আহা ওনাকে থ্যাংক ইউ বলা হলো না।'

'হলো না কেন বলছেন...উনি তো এখনও আছেন'– ডাক্তার সাহেব তাকে জানালেন।

তখন তার মুখে একটা প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল। 'উনি আছেন...?'

ডাক্তার সাহেব আমাকে তার সামনে ঠেলে দিলেন। তিনি উঠে বসতে চাইলেন। ডাক্তার তাকে বললেন, 'না না, এখনই উঠবেন না। এই যে ইনি এনার গাড়ি করে আপনাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছেন।'

তিনি বললেন, 'থ্যাংক ইউ।'

আমাকেই।

আমি কী বলব, উত্তর খুঁজছিলাম।

এরই মধ্যে পুলিশের অয়্যারলেস মেসেজ আসতে লাগল।

পুলিশ অফিসারটি ওয়্যারলেস মুখের কাছে ধরে বললেন, 'আমি হসপিটালে। ওভার।'

অয়্যারলেসে ধাতব স্বরে বার্তা এল, 'স্যার বেবিঅলাকে ধরছি স্যার। সে বলে হার্ডব্রেক করায় মহিলা মাথায় আঘাত পাইছে। ভদ্রলোক ওনাকে হসপিটালে পৌঁছানোর কথা বলে গাড়িতে তুলে নিছে স্যার।'

প্রথমে ভেবেছিলাম এই বেটা নীরস পুলিশ অফিসারের কাণ্ডজ্ঞান নাই। হসপাতালের ভেতরে সে কেন অয়্যারলেস অন করে রেখেছে? কিন্তু তার বার্তাটা

ওভারহিয়ার করে মনে একটু স্বস্তি পেলাম।

পুলিশ অফিসার অয়ারলেসে বললেন, 'হসপিটালে ঠিক ভাবেই উনি পৌঁছে দিছে। বেবিঅলাকে রাখো। ওভার।'

তিনি অয়ারলেস বন্ধ করলেন।

আমি কমলা জামাকে চোরাচোখে দেখছিলাম। এতক্ষণ নানা উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় তার মুখখানি ভালো করে দেখার সুযোগ পাইনি। এখন সব ফাঁড়াই মনে হচ্ছে কেটে যাচ্ছে।

আমি শুধু এতোটুকু বলব, তার চোখেমুখে একটা সহজ সৌন্দর্য আছে। সে খুব সুন্দর, অথচ তার চোখেমুখে কোথাও কোনো উচ্চকিত ভাব নেই। তার নাক-ঠোঁট পাতলা, চোখ উজ্জ্বল, সদা হাস্যময়, তারা দুটো যেন সারাক্ষণ দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

আমি বললাম, 'এখন কি একটু ভালো লাগছে?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। এখন ঠিক আছি।'

আমি বললাম, 'আপনার বাসায় খবর দেওয়া হয়েছে?'

ডাক্তার বললেন, 'না, তা দেওয়া হয় নি। আমরা তো ওনার ঠিকানাই জানতে পারছিলাম না। এখন জেনে নিয়ে ফোন করে দেওয়া যাবে।'

কমলা-রং বললেন, 'আমার মনে হয় আমি এখন নিজেই চলে যেতে পারব। এখন বাসায় ফোন করলে ওরা অযথা দুশ্চিন্তা করবে। স্যার, আমি কি যেতে পারব না? একটা ইয়েলো ক্যাব যদি ডেকে দিতেন।'

এমন সময় হাত-পা ভাঙা একটা রোগী রক্ত আর আর্তনাদ নিয়ে ঢুকে পড়ল স্ট্রেচারে করে।

তরুণীটি ভয়-পাওয়া স্বরে বললেন, 'আমাকে এখান থেকে সরান স্যার। এ সব দেখলে আমি আবার অজ্ঞান হয়ে যাব। আমি একদম রক্ত দেখতে পারি না।'

ঠিক কথা। আমিও রক্ত দেখতে পারি না। উনি যদি অজ্ঞান না হন, আমি হব। তাহলে কি ওই মেয়েকে আটকে রাখা হবে? আমি যেমন তাকে এনেছি, তেমনি তিনিও তো আমাকে এনেছেন। আপনার পেছনে পেছনে কুকুর এসেছে, এ কুকুর নিশ্চয় আপনার! আর আপনি যে কুকুরের পেছনে পেছনে এলেন, আপনি নিশ্চয় কুকুরের।

আমরা সবাই ডাক্তারের চেম্বারে দিকে পা বাড়ালাম। তরুণী বেড থেকে নেমে আস্তে আস্তে হেঁটে আমাদের সঙ্গে এলেন। তাকে সাহায্য করলেন একজন সিস্টার। আমরা ডাক্তারের টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে পড়লাম। ডাক্তার সাহেব ফ্যান ছেড়ে দিলেন।

ডাক্তার তরুণীকে বললেন, 'আপনার নাম? আমাদের রেজিস্টারে লাগবে।'

তিনি বললেন, 'আমার নাম হৃদিতা হক।'

'ঠিকানা?'

হৃদিতা ঠিকানা বললেন।

ফাদার'স অর হাজবেন্ড'স নেম?

'ফাদার'স। আমিনুল হক।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনি যদি কিছু বলেন...'

পুলিশ অফিসার হৃদিতাকে বললেন, 'আপনি দেখেন তো আপনার জিনিসপত্র সব ঠিক আছে কিনা। বেবিওয়ালাকে আমরা আটক করছি। যদি কিছু...'

হৃদিতা ব্যাগ হাতড়ে দেখলেন, কান... 'মনে হয় সব ঠিক আছে...'

পুলিশ বললেন, 'আপনাকে বেবিওয়ালা কিছু খেতে দেয় নি তো?'

তিনি মাথা নাড়লেন, না।

পুলিশের সন্দেহ যায় না। বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, ওনাকে কোনো কিছু দিয়ে সেন্সলেস করা হয়নি তো...'

হৃদিতা জোরে মাথা নাড়লেন, 'আরে না।'

ডাক্তার তাকে সমর্থন করলেন, 'মনে হয় না।'

পুলিশ অফিসার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবির সাহেব, আপনি কি বেবিওয়ালার কোনো ব্যাড মোটিভ দেখেছেন?'

আমি বললাম, 'না, তেমন কিছু তো মনে হলো না।'

পুলিশ অফিসার তখন আসল প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন, 'তা হলে উনি সেন্সলেস হলেন কেন?'

হৃদিতা বললেন, 'আমিই বলি। স্কুটারে যাচ্ছি। এমন জ্যাম। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। আমার চোখ-মুখ অন্ধকার হয়ে আসছে। তার মধ্যে হঠাৎ এমন ব্রেক করেছে মাথা গিয়ে লাগল রডের সাথে।'

ডাক্তার তার কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, 'এ রকম কেস আগেও এসেছে। ঢাকার বাতাস এমন পলুটেড। আর স্কুটারগুলো তো রীতিমতো পয়জনাস...আনবার্নট ফুয়েল বের হয়...সেন্সলেস না হওয়াই অস্বাভাবিক।'

পুলিশ অফিসার সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হলো। বললেন, 'ঠিক আছে তাহলে... কবির সাহেব আপনি যেতে পারেন...

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে সবাইকে বললাম, 'থ্যাংক ইউ... ঠিক আছে আমি তাহলে এবার বিদায় নিই।' আর তার দিকে চোখ রেখে বললাম, 'আপনি ভালো থাকবেন।'

হৃদিতা বলল, 'আপনি চলে যাচ্ছেন... আপনাকে যে কীভাবে থ্যাংকস দেব, আমিও যাব।' তিনি ডাক্তারকে বললেন, 'স্যার, আপনারা আমার অনেক উপকার করেছেন...আরেকটু যদি করতেন...একটা ট্যাক্সি...'

ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোনদিকে যাবেন?'

'ধানমন্ডি'– আমি জানালাম।

ডাক্তার বললেন, 'কলাবাগান দিয়েই তো যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনি কি ওনাকে একটা লিফট দেবেন?'

হৃদিতা আপত্তি জানালেন। বললেন, 'ওনার সময় নষ্ট হবে...'। চিন্তা করুন, আমি সংজ্ঞাহীন তাকে আনতে পারলাম, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে এতটা সময় বসে থাকতে পারলাম, আমার সময় নষ্ট হলো না, আর সজ্ঞান তাঁকে নিয়ে যেতে আমার সময় নষ্ট হয়ে একেবারে পচে-গলে যাবে?

মুখে বললাম, 'না সময় আর নষ্ট কী হবে... পথেই তো...'

ডাক্তার তার বিশেষজ্ঞ-মত দিলেন, 'ঠিক আছে তাহলে আমার মনে হয় আস্তে আস্তে উঠে আপনি যান...মনে রাখবেন আজ সারাদিন কিন্তু আপনার বেড রেস্ট... কোনো সমস্যা হলে জানাবেন...আশা করি সমস্যা হবে না। বুয়া, আপাকে ধরে গাড়িতে দিয়ে আসেন।'

একজন আয়া এসে হৃদিতাকে ধরল। হৃদিতা বললেন, 'না না, আমি ঠিক আছি, একাই যেতে পারব। আমাকে ধরতে হবে না।' আয়া তার কথায় তেমন গা না করে তার বাহু ধারণ করেই রইল। আমরা বাইরের ফটকের দিকে এগুতে থাকলাম । আমি দ্রুত পা চালাচ্ছি। গাড়িটা এদিকে আনতে হবে।

শরীরে ক্লান্তি ছিল। পা চলতে চাইছিল না। বহুদিন একা একা ঘর থেকে বের হই না। আজ ড্রাইভার আসে নি বলেই একাই বেরিয়েছি। ঢাকা শহরে গাড়ি চালানো মানে যেন এবড়ো-খেবড়ো পথে গরুগাড়ির জোয়াল কাঁধে নেওয়া। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার মনে সাংঘাতিক জোর। একজন চমৎকার তরুণীকে আমি সহযাত্রী করতে যাচ্ছি। আমি যেন মাটির ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। গাড়ি নিয়ে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড় করালাম। নেমে গিয়ে পাশের দরজা খুলে দিলাম। তিনি উঠলেন। তারপর নিজের ব্যাগ খুলে ১০টা টাকা দিলেন বুয়ার হাতে। বুয়া আসি আপা বলে টাকা নিয়ে বিদায় নিল। (তাকে তার বাসার দরজায় নামিয়ে দিতে আমি যখন গাড়ির দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকব, তখন আমাকেও কি তিনি ১০ টাকার একটা নোট দেবেন। দিলে আমি সেটা চিরকাল রেখে দেব।)

আমি ডান দিকে গিয়ে দরজা খুলে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসলাম। আমার নাকে এসে লাগল নারী-সুগন্ধীর ঢেউ। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সচেতন হয়ে উঠল।

আমি গাড়ির এক্সেলেটরে চাপ দিলাম।

একটা কিছু কথা বলা দরকার, কী বলব? নাকি ক্যাসেট প্লেয়ারে গান ছেড়ে দেব। ঠিক বুঝছিলাম না। নীরবতার ভারি পারদটুকু তিনিই সরিয়ে দিলেন।

বললেন, 'আপনার অনেক সময় আমি নষ্ট করলাম।'

আমি বললাম, 'না কী বলেন...'

তারপর খানিক ক্ষণের বিরতি। যেন তিনি দম নিচ্ছেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন...আমি যে আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব।'

এবার আমার সত্যিকারের লজ্জিত হবার পালা। 'ছিঃ ছিঃ, আমি কীভাবে আপনার প্রাণ বাঁচালাম?'

হৃদিতা বললেন, 'একটা মেয়ে রাস্তায় পড়ে আছে, কত বিপদ-আপদ হতে পারত...আপনি না থাকলে কী যে হতো...'

আমি বিনয়াবনত, বললাম, 'কিছুই হতো না, বাংলাদেশে এখনও একজনের বিপদে অন্যে এগিয়ে আসে। কেউ না কেউ আসতই।'

গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। রাসেল স্কোয়ারের কাছে এসে দেখি ট্রাফিক ক্রসিংয়ে লাল লাইট জ্বলছে। দাঁড়াতে হলো।

আমি একটু একটু ঘামছি। গাড়ির এসি বাড়িয়ে দিলাম। আবার নীরবতা। নীরবতা, কথা না বলাটাও যে একটা কাজ হতে পারে, একটা ঘটনা হতে পারে, আপনি যদি সদ্য-পরিচিত এক ভীষণ সুন্দর তরুণীর আধ-হাত দূরত্বে একই ছাদের নিচে একা একা বসে থাকেন, কেবল তখনই হয়তো অনুভব করতে পারবেন। কথা বলা উচিত। কী বলব? কয় ভাইবোন, বাসায় কে কে আছেন, কী পড়ছেন, এসব তো জিজ্ঞেস করাই যায়। কোন প্রশ্নটা আগে করব, ভাবছি। তিনি বলে উঠলেন, 'ভাগ্যি আমার এক্সিডেন্টটা হয়েছিল?'

আমি বিস্মিত– 'কেন একথা বলছেন কেন?'

'আমি এত বড় একজন আর্টিস্টের পাশে বসার সুযোগ পেলাম।'

'মানে?'

'আপনি আর্টিস্ট কবিরুল ইসলাম নন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার মতো একজন বিখ্যাত লোক আমাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে... আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।'

আমি এবার বিনয় করে নয়, আন্তরিকভাবেই বললাম, 'আমি মোটেও বিখ্যাত কেউ নই।'

'কী বলেন, আপনি তো স্টার!'

'কী স্টার? ফিল্টার স্টার, নাকি সাদা স্টার?'

'মানে?'

'মানে স্টার সিগারেট?'

'আরে না। সিরিয়াসলি বলছি', তিনি যুক্তি দেখালেন, 'আপনার ছবি সাক্ষাৎকার আমি কাগজে দেখেছি।'

'ও তো এক্জিবিশন ছিল বলে। এক্জিবিশনের সময় বাংলাদেশের সব আর্টিস্টের ছবিই কাগজে বের হয়, এটা কোনো ঘটনাই না।'

'আপনার জন্যে ঘটনা না। কিন্তু আমার জন্যে অনেক বড় ঘটনা।' যেন তিনি নিজেই বলছেন নিজেকে।

একজন আর্টিস্টের জন্যে এর চেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে? শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতো স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষ আর কে আছে? তারা যা কিছু করেন, তা এক সময় সবার আর সব সময়ের সম্পদ বলে বিবেচিত হতেও পারে বটে, কিন্তু মূলত তারা তা করেন তার নিজের জন্যে, নিজের পরিতৃপ্তির জন্যে, অতৃপ্তির দহন থেকে বাঁচার জন্যে এবং প্রাণীর যে জৈবিক ধর্ম, নিজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, বীজ ছড়িয়ে চারা গজিয়ে যাওয়া, নিজে চলে গেলেও সন্তানসন্ততির মধ্য দিয়ে নিজেকে অমর করে রাখা, সেই মৌলিক প্রবণতার কারণেই। এতই যদি তারা নিঃস্বার্থ হবেন, তবে ছবি এঁকে তার নিচে নিজের স্বাক্ষর না দিলেই পারেন, কবিতা লিখে নিজের নামে প্রকাশ না করে খাতাটা পথের ধারে ছুড়ে মারলেই তো হয়। শিল্পীদের মতো প্রশংসাকাতর প্রাণী এই জীবজগতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

আর পুরুষশিল্পীর বেলায়? ভদ্র ভাষায় বললে বলতে হয় তার দরকার হয় অনুপ্রেরণা, সোজা চাঁছাছোলা ভাষায় বলা যায়, সুন্দরী নারীর প্রশংসা অর্জন করতে পারলে তো তার জন্যে সে আত্মবিক্রিত হয়ে থাকতে পারে।

'আপনার জন্যে ঘটনা না। কিন্তু আমার জন্যে অনেক বড় ঘটনা।' আমার পার্শ্ববর্তিনীর এই উক্তিতে যেন আমি আমার মানবজন্মের সার্থকতা খুঁজে পেলাম।

এসি বাড়ানো আছে, কিন্তু আমি ঘামতে লাগলাম।

কী করি? উপায় না পেয়ে আমি সামনে যে ক্যাসেটটা পেলাম, প্লেয়ারে ঢুকিয়ে দিলাম।

সে আপনাতে আপনি বেজে উঠল :

আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায় ॥
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে– ভালোবাসে আড়াল থেকে–
আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায় ॥

লালবাতি সবুজ হলো। হলুদ জ্যাকেট পরা পুলিশ সার্জেন্টরা তৎপর হলেন, হাত নেড়ে নেড়ে বললেন, চলো।

আমার গাড়ি এগুচ্ছে।

হৃদিতা বললেন, 'বামে। এই তো এসেই গেছি প্রায়।'

আমার মনটা যেন খালি খালি লাগছে। ট্রাফিক সার্জেন্টগুলোর ওপরে রাগ হলো। তোদের কে বলেছে বামের রাস্তা ক্লিয়ার করতে?

রোজ কত কত ঘণ্টা কত কত লোক যানজটে কাটাচ্ছে, আর ওদের কী এমন দায় পড়ল যে আজ রাস্তা ওরা পরিষ্কার করে দিল।

'এই লেন। বামে, আবার বামে' বলে তিনি আমাকে লেক সার্কাস লেনের একটা ছয়তলা বাড়ির সামনে আনালেন।

'এই বাড়ি।'

আমি নেমে তার দরজা খুলে দিতে এগিয়ে গেলাম। তিনি নিজেই নামলেন।

বললেন, 'আমি কি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি?'

'জি?'

'কাইন্ডলি আমাদের বাসায় একটু বসবেন?'

আমার যে ইচ্ছা হচ্ছিল না, তা নয়। কিন্তু সেটা কি উচিত হবে? আর তা-ছাড়া মা খুব চিন্তা করছেন নিশ্চয়।

বললাম, 'আজকে যে সময় নাই। আজ থাক। আরেক দিন...'

হৃদিতা ঘড়ির দিকে তাকালেন, 'ইয়া আল্লা...তিনটা ঘণ্টা আপনি আমার পেছনে নষ্ট করেছেন? তাই তো...জোর করতেও পারছি না। ঠিক আছে আরেক দিন আসবেন প্লিজ...'

'ঠিক আছে।'

'খোদা হাফেজ... আপনি ওঠেন গাড়িতে।'

বললাম, 'না আপনি আগে ঘরে ঢোকেন। আপনার বাসা কোন ফ্লোরে?'

'দোতলায়।'

'যেতে পারবেন। চলেন না হয় আমি এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'না না। আপনি আগে ওঠেন।'

'না। তা হয় না। তীরে এসে তরী ডোবানো যাবে না। আমি এতক্ষণ যখন পেরেছি, আপনাকে দরজায় পৌঁছে দিয়ে তারপর যাই।'

তিনি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। 'আচ্ছা। আসেন।' সুন্দর করে হাসলেন। এরকম হাসি দেখলে যে কোনো পুরুষের এ রকম মনে হতে পারেই যে, ইস তার পায়ে যদি জীবনটা সঁপে দেওয়া যেত। আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।

আমরা দোতলায় উঠলাম।

হৃদিতা কলবেল টিপতে এগিয়ে গেল। আমি দোতলার এই পরিসর, সিঁড়ি ইত্যাদি দেখতে লাগলাম। মনে হয় কোনো ফ্লোরে বিয়ে-সাদি ছিল। সিঁড়িতে আলপনা আঁকা। দরজা খুলে গেল। মনে হল গৃহপরিচারিকা।

বললাম, 'এবার তাহলে আমি আসি।'

তিনি বললেন, 'চলেন আপনাকে আমি এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'আরে না যান তো ভেতরে...'

'চলেন গাড়ি পর্যন্ত...'

'আপনি ভেতরে যান।'

'আপনি গাড়িতে বসেন।'

'না না তা হয় না।'

'না না।'

শেষে আপস-প্রস্তাব দিলাম। বললাম, 'আচ্ছা ঠিক আছে আপনিও ভেতরে যান আমিও গাড়ির দিকে যাই, এক সাথে ঠিক আছে?'

'আচ্ছা। তাহলে সে কথাই রইল। আপনি আরেকদিন অবশ্যই আমাদের বাসায় আসছেন।'

'আসব।'

আমি সিঁড়িতে পা রাখলাম।

গাড়িতে এসে উঠছি। আমার মনে হলো একজোড়া চোখ বারান্দা থেকে আমার পিঠে আছড়ে পড়ছে। তাকিয়ে দেখছে আমার এই চলে যাওয়া।

গাড়ি স্টার্ট দিলাম। দু'পাশের আয়না দেখে নিতে হয়। দেখলাম, বাম পাশের আয়নাটা চুরি হয়ে গেছে। বাহবা, এক্সপার্ট চোর তো। একমিনিটেই...

যাক, দাম বেশি নয় এ গ্লাসের। জাপানি হলে তিনশ টাকা। দেশি হলে একশ।

কিছু পেতে হলে কিছু হারাতে হয়।

তিনশ টাকা এমন বেশি কিছু নয়।

গাড়ি চলছে। গান বাজছে :

আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন।

যাবার বেলায় দেব কারে বুকের কাছে বাজল যে বীণ ॥

ফেরার পথে ঠিকই যানজট পেলাম। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। কপালের ইয়ার্কি। আসলেই অদৃষ্ট জিনিসটা এত ইয়ার্কি জানে! অনেক্ষণ যানজটে একাকী বসে থাকতে হলো। রাত যত দুঃখেরই হোক না কেন, একসময় ভোর হবেই। যানজট যত অমোচনীয়ই হোক না কেন, একসময় সেটা ছাড়বেই। আমার রাস্তাও এক সময় পরিষ্কার হয়ে গেল। গাড়ি নিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকে পড়লাম। আমাদের বাসাটা একতলা। পুরোনো হয়ে গেছে। আশপাশে সবাই যার যার জায়গা ডেভলপারকে দিয়ে দিচ্ছে অ্যাপার্টমেন্ট বানানোর জন্যে। আমরা এখনও দেই নি। বাসার সামনে একটু লন আছে। গাছগাছালিভরা বেশ ছায়াঠাণ্ডা পরিবেশ। গাড়িটা গ্যারাজে তুলে রাখলাম।

দেখি মা দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। মশা-ঠেকানোর নেটঅলা দরজা ঠেলে ধরে।

মা বললেন, 'কী বুড়ো। এত দেরি হলো কেন?'

আমি হাসলাম। 'একটু দেরি হবে, আমি তোমাকে ফোন করে বললাম না।'

'এটা কি একটু দেরি। শরীর ঠিক আছে?'

'আছে মা।'

'যা, ঘরে গিয়ে একটু দম নে। গরম পানি চুলায় আছে। গোসল করে নে। শোন আগে জিরোবি, তারপরে গোসল। না হলে আবার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

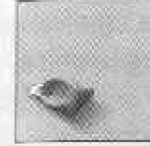
'তুমি খেয়েছ মা?'

'কী একটা কথা জিজ্ঞেস করলি।'

'কেন খাও নি তুমি মা? আমার তো আসতে আরো দেরি হতে পারত?'

'যা তো। ঘরে যা।'

আমি ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। মা বকবক করছেন, এই জয়নাল ড্রাইভারকে এবার বাদ দিয়ে দিতে হবে। ওর বউয়ের কয়বার বাচ্চা হয়। ছয় মাস আগেই না একবার বাচ্চা হলো। রোজ কি আমাদের গাড়ি লাগে নাকি? যেদিন লাগে সেদিনই যদি তাকে না পাওয়া গেল তাহলে আর ড্রাইভার রেখে কী লাভ?



হৃদিতার কথা

আজ আমার জীবনে এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে। ভয়াবহ সুন্দর। অসহ্য সুন্দর। সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগারের মতো সুন্দর আর হিংস্র।

আজ আমি একজন মানুষের দেখা পেয়েছি। আজ আমি একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। আজ আমি একজন মানুষের পাশে বসেছি। আজ একজন মানুষ আমাকে তার পাশে বসিয়ে আমার বাসার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। যখন ঘটনাটা ঘটল, তখন কিন্তু কিছু মনে হয় নি। এখন মনে হচ্ছে, কী সর্বনাশা মুহূর্তের মধ্য দিয়েই আমি গিয়েছি। আমার কেমন যেন লাগছে। তিনি আমার পাশে বসেছিলেন ভাবতেই আমার শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। বিশ্বাস না হলে দেখুন, আমার রোমকূপগুলো সব বৃষ্টিতে জেগে ওঠা দূর্বাঘাসের মতো নড়ে উঠছে।

কেন এমন হচ্ছে? তিনি বিখ্যাত বলে? তিনি দেখতে অত্যন্ত যাকে বলে সুপুরুষ বলে? তিনি খুব সুন্দর করে কথা বলেন বলে? তিনি হেসে হেসে এমন সুন্দর ব্যবহার করেন, যে মনে হয় আত্মবিক্রীত হয়ে থাকি!

নাকি এসবই বানানো। নাকি এসবই আমার কল্পনা! এই যে ভালোলাগার তীব্র অনুভূতিতে আমার সর্বান্তকরণ– যেন আমার সমস্ত অস্তিত্ব– এখন ছেয়ে আছে, এসবই আমার মনের ঘোর? তার ভেতরে কিছুই নেই!

কিন্তু এ কি কিউপিডের চক্রান্ত নয় যে আমি রাস্তায় জীবনে প্রথমবারের মতো অজ্ঞান হয়ে যাব, আর তিনিই এসে আমার পাশে দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়াবেন। আচ্ছা, তিনি কি নিজে আমাকে কোলে করে গাড়িতে তুলেছেন? হয়তো! নইলে আমার কোনো জিনিসপত্র খোয়া গেল না কেন?

ইস আবার তার সাথে কি কোনোদিনও দেখা হবে? কায়দা করে তার গাড়িতে

একটা কিছু ফেলে রাখলেই তো হতো। তাকে ফোন করা যেত! তার বাসায় জিনিসটা আনার নাম করে গিয়ে তার সাথে দেখা করা যেত! চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। এ বুদ্ধিটা আগে কেন মাথায় আসেনি?

আমার চোখে জল আসছে। কেন?

বাসায় ফিরে এসে আমি শুয়ে পড়লাম। মাকে এখনও কিছু বলিনি। বললেই তিনি মহাহইচই বাধিয়ে দেবেন। এখন আমার হইচই ভালো লাগবে না।

মা বললেন, 'এসেই শুয়ে পড়লি যে বড়ো। গোসল করে ভাত খা।'

'ভাত খেতে ইচ্ছা করছে না। আমি এখন একটু রেস্ট নেব।'

'খালি পেটে আবার রেস্ট কী? সকালেও তো কিছু মুখে দিয়ে বের হোস নি?'

'কেন। টোস্ট বিস্কুট খেলাম না? আচ্ছা এক কাজ করো। একটু ওভালটিন বানিয়ে দিতে বলো না ফতেকে। ভাতটা একটু পরে খাই।'

'যা ভালো মনে করিস কর। কথা শুনলে তো হতোই।'

ওভালটিন বানিয়ে দিয়ে গেল ফতে। খেয়ে নিয়ে চোখ বন্ধ করে সটান শুয়ে পড়া গেল। মনে হয় ডাক্তার আমাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। ঘুম পাচ্ছে খুব।

চোখ বন্ধ করে আছি। তন্দ্রা-তন্দ্রা ভাব।

ঘুম পুরোটা আসছে না। শুধু মাথার মধ্যে তার কথা ঘুরপাক খাচ্ছে।

আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যেজন ভাসায় ॥
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে– ভালোবাসে আড়াল থেকে–
আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায় ॥

মাথার মধ্যে গানের কথাগুলো ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো বেজে চলেছে। রবীন্দ্রসংগীত। এর আগে তেমন মন দিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের গান শুনিনি। আজ কান দিয়ে শুনতে হচ্ছে না, মাথার ভেতরে নিজেই বেজে চলেছে। ঘুমিয়ে পড়ি এক সময়।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন বিকেল। খিদে পেয়েছে।

ঠাণ্ডা ভাত গরম ডিম ভাজা দিয়ে খেতে পারলে ভালো হতো। ফতেকে ডেকে বললাম ডিম ভাজতে। চোখে-মুখে পানি দিতে বাথরুম গেলাম। আয়নায় নিজের মুখ দেখে মনে হলো, আমি তো দেখতে খারাপ নই। তিনি কি আমাকে পছন্দ করেন নি? ভালো না লাগলেও কি শুধু মানবিক কারণে একজন ভদ্রলোক একটা পথের ধারে পড়ে থাকা মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে? কী জানি, পারতেও পারে! তবে নিয়ে যেতে যেতে কি তিনি মেয়েটির প্রতি একটুও আকৃষ্ট হবেন না?

ভাত খাচ্ছি গরম ডিম ভাজা দিয়ে। মন্টি এসে হাজির। মনে হয় ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিল কলাবাগান মাঠে। তার গায়ে ঘাম, টি-শার্ট ভিজে গেছে একেবারে। মাথায় ক্যাপ।

বলল, কী ব্যাপার, ভাত খাচ্ছ যে বড়ো। স্লিম হবার প্রজেক্ট মাথায় উঠল?

কয়েকদিন আগে আমার বাতিক উঠেছিল স্লিম হবো। আব্বা অবশ্য বলেন, এত অল্প খেলে তো পেটে আলসার হবে। আমি বলি, আব্বা, পৃথিবীতে না খেয়ে যত লোক মরে, খেয়ে মরে তার চেয়ে বেশি লোক। সকালে শুধু শশা, দুপুরে মেপে ভাত আর রাতে দুটো করে রুটি খেতে শুরু করেছিলাম। অবশ্য এ প্রকল্প ধরে রাখতে পারি নি। আবার যথারীতি দু'বেলা ভাত সকালে রুটি ভাজি পরটা মাখন পাউরুটি যাচ্ছেতাই শুরু হয়ে গেছে।

আমার শুধু মনে হচ্ছে, যাই ভদ্রলোককে ফোন করি। কিন্তু ফোন নম্বর পাব কোথায়? ইস মনে করে যদি ফোন নম্বরটা রাখতাম।

বাসায় সকালের ঘটনা জানানো দরকার। মা আসরের নামাজ পড়ে তসবিহ নিয়ে তেলোয়াত করছেন। মন্টি গেল বাথরুমে। আব্বা এখনও অফিস থেকে আসেন নি। আসুন। ফতে দূরদর্শনে বাংলা ছবি দেখছে। পুরোনো দিনের ছবি।

ভাত খেয়ে হাত ধুয়ে আমি বারান্দায় গিয়ে বসলাম। বিকেল আস্তে আস্তে সন্ধ্যার মশারির ভেতরে ঢুকে পড়ছে। বাসার সামনে একটা গাছ আছে। তেজপাতা ধরনের পাতা। কী গাছ, জানি না। তার ডালপালা বারান্দায় এসে ঢুকেছে। আমার খুবই ভালো লাগে। মা অবশ্য সহ্য করতে পারেন না। বলেন, শুঁয়ো পোকা হয়। বাসাঅলাকে বলতে হবে ডাল কেটে দিতে। সুমনের গান মাকে শোনাতে পারলে ভালো হতো, আমি চাই গাছকাটা হলে শোকসভা হবে বিধানসভায়...

আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘন হচ্ছে। আমার খুব একা লাগছে। ঘুম থেকে ওঠা সন্ধ্যা মানেই সর্বনাশ। আমার মনে হচ্ছে এ জগত চরাচরে আমি বড় একা। ঘর থেকে টেলিভিশনের শব্দ আসছে। কোনো এক ফ্ল্যাটে বাচ্চা কেঁদে উঠল। আমার গলা ধরে আসছে। কে যেন হারমোনিয়ামে গান শিখছে। আয় তব সহচরী হাতে হাত ধরি ধরি... গানের গলার সাথে হারমোনিয়ামের সুরের কোনো সঙ্গতি নেই। এই মেয়ের সাথে এ কারণেই কোনো সহচরী নাচতে কিংবা গাইতে রাজি হচ্ছে না।

ডোরবেল উঠল বেজে। আব্বার আসার কথা। নিশ্চয় তিনি এসেছেন। আমি উঠে দরজা খুলে দিলাম। আব্বার হাতে বাজারের ব্যাগ। অফিস থেকে আসার পথে তিনি সওদাপাতি করেছেন। থলে থেকে লালশাক আর একটা সবুজ লাউ উঁকি দিচ্ছে। আব্বার সাদা শার্টের বুক-পকেটের নিচে কালির দাগ। আমি বাজারের ব্যাগ ধরলাম। বললাম, আব্বা, আজকেও আপনার শার্টে কালি লেগেছে? আব্বা অসহায়ভাবে তাকালেন। তাতে যেন তার অব্যক্ত মিনতি, মা, তোর মাকে বলিস না। অযথা চিল্লাচিল্লি হবে। সুন্দর বিজ্ঞাপন হয়, যদি আব্বা বলে ফেলেন, সার্ফ এক্সেল আছে না। ফতে দৌড়ে এলে তার হাতে ব্যাগ হস্তান্তর করা গেল। মন্টির ঘর থেকে জেমসের গান আসছে, আমি তারায় তারায় রটিয়ে দেব...মা বললেন, মন্টি সাউন্ড কমাও। একটু পরে আজান দেবে। তিনি এসে আব্বার পাশে দাঁড়ালেন। আব্বা তাড়াতাড়ি

শার্ট খুলে ফেলেছেন।

এখন চা হবে। আমরা সবাই চা খাব। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট থাকতে পারে। আমি মনে মনে রিহার্সাল করে নিচ্ছি সবাইকে ঘটনাটা কীভাবে বলা যাবে।

চায়ের টেবিলে চা এল। আব্বা ডালপুরি কিনে এনেছেন। তিনি হাঁক ছাড়লেন, মা, মা, ডালপুরি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি আয়।

টেবিলে গেলাম। পলিথিনের ছোট প্যাকেটে একটুখানি তেঁতুলের টকও দেওয়া হয়েছে। পাটের সুতলি দিয়ে সেটা বাঁধা। আব্বা সেটা খোলার চেষ্টা করছেন। তার হাতের নখ ছোট। তিনি পারবেন না। আমার লম্বা নখে কাজটা ভালো হবে।

চাটনিটা আসলেই খুব মজা। ডালপুরিতে এক কামড় দিয়ে আমি বললাম, দারুণ।

মন্টি ডালপুরি ফুটো করে তার ভেতরে চানাচুর ঢোকাচ্ছে। আমি বললাম, 'মন্টি কী করিস?'

মন্টি বলল, 'পিজা বানাচ্ছি।'

'ছোটলোকের মতো করছিস ক্যান। কোনোদিন পিজা খাস নি?' মা বললেন।

'খেয়েছি। কালকেই তো সব বন্ধু মিলে খেলাম?'

'বিশ্রী সব খাবার কী করে যে তোরা খাস?'

বললাম, 'ফ্যাশন মা ফ্যাশন। খাবারেরও ফ্যাশন থাকে। আমাদের কাছে পিজা ভালো, বার্গার ভালো। যেমন ব্যান্ডের গান। তোমরা যেসব গান পছন্দ করো, আমরা করি না। আবার মন্টিরা যেসব করে, তোমরা করো না।'

'লেকচার দিচ্ছিলাম।' মন্টি টিপ্পনি কাটল।

আমি বললাম, 'শোনো আজকে একটা মজার কাণ্ড ঘটেছে। একজন বিখ্যাত মানুষ আমাকে নিজের গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছেন।'

মা ভ্রূ কোঁচকালেন। তিনি কথাটার মানে আর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বোঝার চেষ্টা করছেন।

মন্টি বলল, 'কাণ্ডটা মজার হলো কী করে?'

মন্টি ছেলেটা বুদ্ধিমান।

আমি বললাম, 'মজার হলো। ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে দেখি ক্লাস হচ্ছে না। ওয়ারিতে গেলাম শাম্মীদের বাড়িতে। সেখান থেকে স্কুটারে আসছি। প্রচণ্ড জ্যামে আর ধোঁয়ায় আমার শরীর খারাপ লাগতে শুরু করল। পান্থপথে এসে স্কুটারটা হঠাৎ ব্রেক করেছে, আর আমার মাথা লাগল সামনের রডে। আমি একেবারে অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলাম।'

'তারপর?' মা উদ্বিগ্ন।

'তারপর আর্টিস্ট কবিরুল ইসলাম আমাকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। আমার চিকিৎসা হলো। তারপর আমাকে বাসায় পৌঁছে দিলেন। হিহিহি।'

'যাও। চাপা।' মন্টি তার নিজের বানানো পিজায় আরেক কামড় বসিয়ে বলল।

'মাথায় লেগেছে! এ-তো মারাত্মক ঘটনা। বমি হয়নি তো?' আব্বা বললেন।

'না। তা হয়নি।' বললাম।

'সিটি স্ক্যান করাতে হবে তো।' আব্বার কণ্ঠে সমূহ উদ্বেগ।

'ডাক্তার তো বলল, লাগবে না।' আমি যথাসম্ভব শান্তস্বরে বললাম।

মা হঠাৎ কেঁদে উঠলেন। কান্না থামিয়ে বললেন, 'এই বাড়িতে কি আমি একটা মানুষ নাকি পোষা বিড়াল টিয়াপাখি। তুই এতক্ষণে ক্যান বললি ঘটনা। ক্যান তুই আগে বললি না?'

'আগে বললে তুমি কী করতে? আব্বাকে অফিসে খবর দিতে। আব্বার হার্টের প্যালপিটেশন বাড়াতে।'

'আমি কী করতাম আমি করতাম। এখন যদি তোর একটা কিছু হয়ে যায়? তোর আব্বাকে ডেকে আনলে কী যেন বলল সিটি স্ক্যান না কি ওসব করাত। বুঝেছি একটা পোষা পাখির যে দাম আছে আমার তাও নাই।'

'মা তুমি পোষা পাখি পোষা পাখি করছ কেন? ব্যাপার কী?' মন্টি ফোঁড়ন কাটছে, 'ও বুঝেছি, খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে, ইন্ডিয়ান ময়না ধরা পড়েছে, ময়নাটা যে ইন্ডিয়ান সেটা জানা গেল তখন যখন ময়না মুখ খুলল, সে নাকি হিন্দিতে কথা বলে। দিদি তেরা দেবর দিওয়ানা ধরনের কথা। এই ময়নার দাম ২৫ হাজার টাকা।'

'তুই চুপ কর।' মা রেগে উঠে চলে গেলেন।

আল্লাহু আকবর। মাগরিবের নামাজের আজান হচ্ছে। মা আপাতত যুদ্ধ বিরতি দিতে বাধ্য।

আব্বা বললেন, 'চল, সিটি স্ক্যানটা করিয়ে আনি।'

আব্বা তার এক ডাক্তার বন্ধুকে ফোন করলেন। তিনি বসেন ট্রাস্ট ল্যাবরেটরিতে। জানা গেল, তিনি এখন চেম্বারেই আছেন। তার কাছে গেলে তিনি সাথে সাথে সিটি স্ক্যান করিয়ে রিপোর্ট দিয়ে দেবেন।

আমি এইসব ঝুটঝামেলা এড়াতে চাচ্ছিলাম। এড়ানো গেল না। আব্বা বার বার এসে বলতে লাগলেন, 'চল মা, রহমান চাচার সাথে এপয়েন্টমেন্ট করলাম। চল।'

'চলেন।' বেরিয়ে পড়লাম। রিকশা নিয়ে। ট্রাস্ট ল্যাবরেটরি কাছেই।

আব্বা শক্ত করে রিকশার হুড দুই হাতে ধরে রেখেছেন। আমাকে বললেন, 'ধর, হুড ধর। স্কুটারে বসে যদি তুই ধরে বসতি, তাহলে কি আর এই এক্সিডেন্ট হয়। মাথা ফেটে যায়নি তো?' (আর তাহলে কি আমার সঙ্গে ওই ভদ্রলোকের দেখা হয়? আব্বাটা একেবারে টিপিক্যাল আব্বার মতো কথা বলছেন)

'না। যায় নি।'

'বেবিট্যাক্সি খুব খারাপ একটা ভিহিক্‌ল। কোন লেখায় যেন পড়লাম, বলেছে, দুনিয়ায় ২ পায়ের প্রাণী আছে, ৪ পায়ের প্রাণী আছে, ৬ পায়ের আছে, ৮ পায়ের আছে, কিন্তু ৩ পায়ের নাই। বেবিট্যাক্সি ৩ চাকার জিনিস। প্রকৃতি এটাকে এলাউ করে না। পারতপক্ষে বেবিট্যাক্সিতে উঠবি না।'

রিকশাঅলা বলে বসল, 'রিকশাও তো ছার তিন চাকার, তাইলে রিকশায় যে উঠলেন।'

আমি বললাম, 'সেই জন্যে তো এইভাবে ধরে বসে আছি। আপনি চালান।'

সন্ধ্যাটা সত্যিই সুন্দর। একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আকাশে লালচে আলো মেঘে মেঘে যেন তুলির আঁচড় দিয়ে রেখেছে। একটা বিল্ডিংয়ের গায়ে ইলেক্ট্রিক আলোর নিচে একজন ক্রিকেটারের ছবি, তিনি বলছেন, আমার মাথা ক্লিয়ার, আপনার? শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন। আমার হাসি পেল। ঘুঘু আর ফাঁদের গল্পের ফাঁদের মতো বাগান সাফ করতে গিয়ে আবার পুরো বাগানের গাছ উপড়ে ফেলা হবে না তো? আমার মাথা ক্লিয়ার, কারণ এখন আমি উইগ পরি। আপনার? আচ্ছা, উইগও তো নিশ্চয় পরিষ্কার করতে হয়। শ্যাম্পু দিয়েই করে তো।

স্ক্যানিঙে কিছু পাওয়া গেল না।

কিন্তু যেতে পারত।

আমার মাথায় এখন কিলবিল করছে একটা পোকা। একটা লোক আমার মাথা খেয়ে ফেলেছে।

কবিরুল ইসলাম।

ভাগ্যি সিটি স্ক্যানিংয়ে মানুষের চিন্তাটা ধরা পড়ে না। ধরা পড়লে ওই গানগুলোর কী হতো?– এ মনটা যদি খোলা যেত সিন্দুকের মতো, বুঝাইতে পারিতাম তোমায় ভালোবাসি কতো, অথবা এ হৃদয় খুলে যদি দেখানো যেত, তুমি যে আমার তুমি মানতে...তখন গীতিকার লিখতেন, এই মাথাটা স্ক্যানিং করে দেখো, তোমায় ভালোবাসি কতো...

হায়, কেন যে এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার হলো না? আমার মনটা না হয় আমি জানি, অন্তত তাঁর মনটা যদি স্ক্যানিং করা যেত।

বাসায় ফিরে আসতে আসতে সাড়ে আটটা।

মন্টি পড়তে বসেছে।

'ব্যাপার কী মন্টি? এত মন দিয়ে পড়া হচ্ছে?' আমি বলি।

'ব্যাপার আছে। কালকে কৌটা স্যারের ক্লাস। ভূগোল পড়া দিয়েছে আমাজন নদীর গতিপ্রকৃতি। র‍্যানডম পড়া ধরবে। না পারলে পাছার ছাল তুলে ফেলবে। আমাকে মারতে স্যার আবার বিশেষ আরাম পান কিনা?'

'কেন? তোকে স্পেশালি মারে কেন?'

'কী জানি। মনে হয় আমি স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ি না। তাই হতে পারে। বাদ দাও। কৌটা স্যারের মারের ভয়ে আমার পড়া হচ্ছে, এটা ভালো না? প্রাইভেট না পড়েও আমি এগিয়ে যাচ্ছি। দেখো আমি পরীক্ষায় ভূগোলে কত বেশি নম্বর পাই।'

'গুড। তা তোদের স্যারের কৌটা নামকরণের রহস্য কী?'

'আছে রহস্য।' মন্টি হাসে।

'আমি কি জানতে পারি?'

'পারো। স্যার একদিন কেউটে সাপ পড়াতে গিয়ে কৌটা সাপ বলে ফেলেছিলেন। হিহিহি। আপা, আমি কি এখন একটু টেলিভিশন দেখতে পারি?'

'টিভিতে এখন কী হবে?'

'নাটক।'

'তোমার ভালো তুমি বোঝো। পড়া মুখস্থ না হলে কিন্তু কৌটা থেকে কেউটে বের হবে।'

'নাটক দেখব বলেই তো আগেভাগে পড়তে বসলাম।'

'যা। দেখ গে।'

এ একদিক দিয়ে ভালোই হলো আমার জন্যে। মন্টি পড়ে ক্লাস সিক্সে। আগে মন্টি আর আমি একই ঘরে শুতাম। এখন ড্রয়িং রুমে একটা ডিভান পাতা হয়েছে, রাতে ও ওখানে শোয়। আর এ ঘরে ওর আর আমার পড়ার টেবিল। টিভিটাও ড্রয়িং রুমে। এখন ও যদি টিভি দেখতে যায়, ঘরটা কিছুক্ষণ একলা পাওয়া যায়। আমার এখন একটু একা থাকতে ইচ্ছা করছে। মনটা একটু খারাপ। আব্বার অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেল। রহমান চাচা অবশ্য অনেকটা কনসেশন করে দিয়েছেন। তবু কম টাকা তো নয়। অকারণে। স্ক্যানিংয়ে তো কিছু পাওয়া গেল না। সন্দেহজনক কিছু হলে কি হাসপাতালের ডাক্তার বলে দিতেন না? আব্বা আসলে আমাদের খুব ভালোবাসেন। অতিরিক্ত। কথা বলেন কম, কিন্তু ভালোবাসা হলো এমন একটা জিনিস যেটা বোঝা যায়। আমি তো ক্লাসের ছেলেগুলোর চোখ দেখলেই বুঝতে পারি, কে আমাকে পছন্দ করে, কতটা করে। শুধু কি ক্লাসের, অন্য ক্লাসের ছেলেদের চোখ, তাকানো, তাকানোর ভঙ্গি দেখলেও বলে দিতে পারি, কার মনের মধ্যে আমার জন্যে কতটা মনোযোগ।

তাহলে হৃদিতা হক, আপনি বলুন, কবিরুল ইসলামের চোখে আপনি কী দেখেছেন?

কী দেখেছি? না, তিনি আমাকে অপছন্দ করেননি, তবে খুবই পরিশীলিত ভদ্রলোক তো, পছন্দটা প্রকাশও করে ফেলেন নি। সুশিক্ষিত রুচিবান মানুষ প্রথম দেখাতেই হ্যাংলামো করেন না।

বাইরের কাপড় ছেড়ে বাথরুমে হাত-মুখ ধুয়ে এসে বিছানায় আধা শোয়া হয়ে এসব ভাবছি। মাঝখানে মা এসে খোঁজ নিয়ে গেছেন, কেমন আছি, খারাপ লাগছে কিনা। এখন সবাই মিলে ও-ঘরে টেলিভিশনে নাটক দেখছে।

আমি শুধু প্রার্থনা করছি, রাতটা কেটে যাক কোনোমতে। তাহলে কাল ফোন করা যাবে, তাকে। আজকেই ফোন করটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু ফোন করব বললেই তো হলো না, তুমি ফোন নম্বরটা পাচ্ছ কোথায়? সে একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

ক্যাসেট প্লেয়ারে একটা গান ছেড়ে দিলে কী হয়? ভালো হয়। ভদ্রলোক দেখলাম গাড়িতে রেখেছেন রবীন্দ্রসংগীত। সেও রবীন্দ্রসংগীত ছাড়বে নাকি? সে উঠে ক্যাসেট ছাড়তে যাবে, ঠিক সে সময়ে বিদ্যুৎ চলে গেল। কেমন লাগে? এমন কি আর সরকার সারাক্ষণ বলছে, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটানো হচ্ছে ষড়যন্ত্র করে। এই যে আমি যখন তার মনের কথাগুলো গানে পাব বলে হাত বাড়ালাম, তখনই বিদ্যুৎ চলে যাওয়াটা কি স্যাবোটাজ নয়?

ওই ঘর থেকে নাটকের সুর মাঝপথে কেটে যাওয়ায় বিরক্তি প্রকাশের ধ্বনি আসছে। তারা সরকারের মুণ্ডুপাত করছে।

আমি এ ঘরে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম।

অন্ধকার।

আমি একা। তার কথা ভাবছি।

আর সে কি আমার কথা ভাবছে?

যে কোনো রাত, তা সে যত দীর্ঘই হোক না কেন, এক সময় শেষ হয়। আমার রাতটাও হলো। আজ আর ক্লাসে যাচ্ছি না। অজুহাত খুব জোরদার। কাল একটা এক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। এখনও আমি ঝুঁকিমুক্ত নই। আজ আমার বেডরেস্ট। সকাল ৯টায় ফোন করলাম বাসায় যে দৈনিক সংবাদপত্রটা দেয়, তাদের অফিসে। উদ্দেশ্য, কবির সাহেবের টেলিফোন নম্বরটা যোগাড় করব। কিছুদিন আগে এই কাগজেই কবির সাহেবের ছবি আর তার প্রদর্শনীর খবর ছাপা হয়েছিল। ওরা কি দিতে পারবে না?

ফোন ধরল অপারেটর। সুন্দর করে বললাম, হ্যালো, আমি আপনাদের একজন পাঠক। আর্টিস্ট কবিরুল ইসলামের ওপর একটা খবর ছাপা হয়েছিল কিছুদিন আগে, তার ফোন নম্বরটা কি পাওয়া যাবে?

টেলিফোন অপারেটরটা বাজখাঁই গলায় বললেন, এ নম্বরটা যার কাছে পেতে পারেন, তিনি এখনও অফিসে আসেন নি।

আমি বললাম, আচ্ছা আপনি কি শিল্পকলা একাডেমির নম্বর দিতে পারেন?

হ্যাঁ, একটু ধরেন। তিনি নম্বরটা দিলেন।

এবার ফোন করতে হবে শিল্পকলায়। ওখানে আমার পরিচিত একজন আছে, রিমা ভাবি। নাচেন। আসলে তিনি আমার ক্লাসমেট লিপির ভাবি। তাকেই ফোন করা যায়।

রিমা ভাবিকে পাওয়া গেল। কিন্তু কবির সাহেবের নম্বর নয়। তিনি বললেন, না রে ওনার নম্বর তো আমাদের কাছে নাই।

ব্যর্থ মনে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলাম। একটু একটু কান্নাও পাচ্ছে। শেষে বুদ্ধিটা এলো মাথায়। যে গ্যালারিতে তাঁর ছবির প্রদর্শনীটা হয়েছিল, সেই গ্যালারিওয়ালারা নিশ্চয় বলতে পারবে। গ্যালারির নম্বরটা পেলে হয়। ব্যস আবার ফোন রিমা ভাবিকেই। ভাবি, ওরিয়েন্টাল গ্যালারির নম্বরটা দিতে পারেন?

ধরো, বলে ভাবি আমাকে ধরিয়ে রাখলেন। সম্ভবত তিনি ভুলে গেছেন। তার আলাপ-আলোচনা হাসি-ঠাট্টা সব শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তিনি ফোন নম্বর যোগাড় করে যে আমাকে দেবেন সে লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় আপনারা হলে কী করতেন? যে সব আলাপ শোনা যাচ্ছে সে সব রেকর্ড করে রাখলে শার্লক হোমসের মতো একটা ফাটাফাটি রহস্য উদ্ঘাটনের কাজ চলতে পারে, কিন্তু কবিরের হৃদয় কিংবা ফোনের কোনো হদিস মেলে না।

কিছুক্ষণ, বেশ কিছুক্ষণ আশায় আশায় কানে ফোন ধরে রেখে অবশেষে নিজেই ক্ষান্ত দিলাম।

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ, উদ্যম বিহনে কারো পূরে মনোরথ? চাই উদ্যম। চাই হরলিক্স। মা হরলিক্স হাতে দাঁড়িয়ে। বললেন, এই হৃদি, এতক্ষণ ফোন এনগেজ্‌ড করে রেখে কার সাথে কথা বলিস?

বলেন, কার মেজাজ এ ধরনের প্রশ্নে ঠিক থাকে।

আমি বললাম, তোমার শ্বশুরের সাথে।

'দেখ তো মেয়ের কথা। জান্নাতবাসী লোকটাকে আবার এর মধ্যে টেনে আনিস কেন?'

'আমি কাকে ফোন করি না করি তুমি জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন?'

'কারণ আছে। আমি চুলায় ভাত উঠিয়ে দিয়ে ফোন করতে বসব। এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল, আত্মীয়-স্বজনকে জানাতে হবে না?'

'কী কাণ্ড ঘটে গেল?'

'এই যে। রাস্তায় মেয়ে ফিট হয়ে গেল। তাকে হসপিটালে নিয়ে গেল কে না কে?'

'কে না কে নয়। অত্যন্ত বিখ্যাত একজন ভদ্রলোক। তিনি আর্টিস্ট।'

'ওই হলো। এত বড় এক্সিডেন্টের খবর আত্মীয়-স্বজনকে না জানালে চলে? পরে তারা যদি শোনে কী বলবে?'

'মা। যাও তো তোমার চুলায় তরকারি পুড়ছে, তুমি ওই দিকটা সামলাও। ফতে কি এতসব পারে? যাও।'

আমি আবার ফোন করব রিমা ভাবিকেই। পারিব না এ-কথাটি বলিও না আর, একবার না পারিলে দেখো শতবার।

'হ্যালো, রাশিদা সুলতানা রিমা ভাবি আছেন?'

'ধরুন দিচ্ছি।'

পিএবিএক্সের অপারেটর আমাকে মিউজিক শোনাচ্ছে।

'হ্যালো।' পুরুষের গলা।'

'রিমা ভাবি কি আছেন?'

'উনিতো সিটে নেই।' ভদ্রলোক নাভি থেকে শ্বাস এনে বেসে গলা নামিয়ে কথা বলছেন। যেন পূর্ণেন্দু পত্রীর কথোপকথন আবৃত্তি করছেন।

'ও।'

'কিছু বলতে হবে? কোনো মেসেজ?'

'আমার নাম হৃদিতা হক (এটা বলার কারণ আমি দেখেছি বহুক্ষেত্রে আমার নামটা মিষ্টি করে বললে বেশ কাজ হয়)। আমি ওনার ননদের ক্লাসমেট। আমার মনে হয় আপনি আমার একটু উপকার করতে পারেন। ছোট্ট উপকার।'

'জি, বলুন, আমি আপনার কী কাজে লাগতে পারি?'

'ওরিয়েন্টাল গ্যালারির ফোন নম্বরটা যদি দিতেন?'

'এক মিনিট।'

সত্যি এক মিনিটের মাথায় আমি ফোন নম্বরটা পেয়ে গেলাম। তাকে বললাম, 'আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব।'

তিনি বললেন, 'দরকার হবে না। দিস ইজ মাই প্লেজার।'

এবার অপারেশন *গ্যালারি ওরিয়েন্টাল*।

হে আল্লাহ এবার যেন আমি সফল হই।

আমার একটা কুসংস্কার আছে। আমাদের টেবিল-ঘড়িটা উল্টো করে রাখলে সাধারণত আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে। আমি আবার সৌরভ গাঙ্গুলির অন্ধ ভক্ত। তার খেলা থাকলে আমি যখন ঘড়িটা উল্টো করে রাখি, তখন অপোনেন্ট হয় আউট হয়, নয়তো গাঙ্গুলি ছক্কা হাঁকে।

আমি গিয়ে ঘড়িটাকে উল্টো করে রাখলাম। এবার গ্যালারি ওরিয়েন্টাল। ডিজিটের বোতাম চাপছি। রিং হচ্ছে, রিং হচ্ছে। 'হ্যালো...'

'হ্যালো, গ্যালারি ওরিয়েন্টাল?'

'জি।'

'আমি একটু কবিরুল ইসলাম সাহেবের নম্বরটা চাচ্ছিলাম।'

'আপনি কে বলছেন?'

'আমি ... আমি রিমা বলছি...শিল্পকলা একাডেমি থেকে...(মিথ্যা বলতে হলো। দুটো ব্যাপারে মিথ্যা বললে পাপ হয় না। এক. যুদ্ধ। দুই. না, দ্বিতীয় ব্যাপারটা বলা যাবে না।)

'ধরুন এক মিনিট।'

তিনি এক মিনিটকে ধরতে বললেন তার গলাটা ফ্যাসফেসে। আমাদের ক্লাসের রিয়াজের এ-রকম কণ্ঠস্বর। আমাদের কানিজ এ-গলাকে নাম দিয়েছে বালি-ঘষা ভয়েস।

বালি-ঘষা ভয়েস আমার জীবনের সবচেয়ে বড় উপকারটা করলেন। আমাকে কবিরুল ইসলামের নম্বরটা দিয়ে দিলেন। আমি নম্বরটার দিকে মায়াভরা চোখে তাকিয়ে আছি। ভারি অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না। আমার বড় রোমাঞ্চ হচ্ছে। কী জাদুকরি ব্যাপার! আমাদের চিরপরিচিত সংখ্যাগুলোও এত সহজেই তার অর্থ আর মূল্য এভাবে পাল্টে ফেলে অমূল্য হয়ে উঠতে পারে।

তাহলে এখন, হৃদিতা হক, গেট সেট রেডি। আপনি এখন ফোন করতে যাচ্ছেন আপনার কাঙ্ক্ষিত নম্বরে।

একটা করে নম্বর টিপি আর নিজের বুকের ভেতরে একটা করে হাতুড়ি পড়ে। রিং হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি। বুক কাঁপছে। ওপারে রিসিভার তোলা হলো।

'হ্যালো।' মহিলা কণ্ঠ।

'হ্যালো', নিজের গলা নিজের কাছেই অপরিচিত লাগছে। এত নার্ভাস হয়ে পড়েছি। তবু কণ্ঠে জোর আর বুকে সাহস এনে বললাম, 'এটা কি শিল্পী কবিরুল ইসলামের বাসা?'

'হ্যাঁ! আমি ওর আম্মা বলছি।'

'স্লামালেকুম খালাম্মা। উনি কি আছেন?'

'ও তো গোসলে আছে! তা মা তুমি কে বলছ?'

'আমাকে তো খালাম্মা আপনি চিনবেন না।'

'না চিনলেও অসুবিধা নাই। তোমার নামটা বলো।'

'আমার নাম হৃদিতা।'

'হৃদিতা। খুব সুন্দর নাম তো। আনকমন। ঠিক আছে মা বুড়ো বের হলে ওকে বলব তোমার কথা। ও তোমাকে ফোন করবে এখন। আচ্ছা।'

মনে মনে বললাম, বুড়ো? কিন্তু বুড়ো তো আমার ফোন নম্বর জানেন না। আর গলায় শব্দ বের করে বললাম, 'ঠিক আছে আমিই ফোন করব এখন। রাখি।'

এই অপারেশনের মূল্যায়ন করা দরকার। সাফল্য শতকরা ৫০ ভাগ। কারণ তার নম্বরটা ঠিকভাবেই পাওয়া গেছে। আর ব্যর্থতা, সেও ৫০ ভাগ। তাকে পাওয়া যায়নি, তবে পাওয়ার আশা আছে।

এখন কর্তব্য হলো লেগে থাকতে হবে। উনি গোসলে আছেন। কতক্ষণ গোসল করতে পারেন। আধঘণ্টা। ঠিক ৩০ মিনিট পরে আবার ফোন করতে হবে।

ফোন রেখে আমার ঘরে গেলাম। এক ধরনের উত্তেজনা হচ্ছে। কী করা যায় এখন? আধঘণ্টা কখন পার হবে?

আব্বা অফিসে গেছেন। মন্টি স্কুলে। মা রান্নাঘরে। বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ঘরদোর। ভালোই।

ঠিক এসময়ে মা গেলেন ফোনের কাছে। সর্বনাশ। মা কি আর সহজেই ফোন ছাড়বে। আমি এখন কী করি? টিভি দেখব। সিএনএন। বিবিসি। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক। এটিএন বাংলায় বাংলা ছায়াছবি। পড়ে না চোখের পলক। কী তোমার রূপের ঝলক।

নাহ। কিছু ভালো লাগে না। আমার কী হলো?

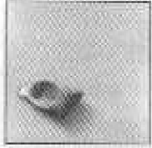
মা ফোন ছাড়ছেন না। ছাড়বেনও না। ঝাড়ি লাগাতে হবে।

'মা, মা, ফোনে এত কথা বলার কী আছে? কী রান্না করলে, না করলে, এটা আলাপ করার জন্যে ফোন নয়। ফোন হলো মানুষের জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্যে বুঝলে। রাখো ফোন।'

মা আরো দশ মিনিট কাকে যেন নারকেল বাটা চিংড়ি দিয়ে রান্না করার রেসিপি বোঝালেন। হ্যাঁ আঁচ পেলে চিংড়ি কমলা রঙের হবে। তারপর নামাবি। তারপর নারকেলের দুধ দিবি।

ইস। নারকেলের দুধ? ছাগলের দুধ দাও। অসহ্য।

আধ ঘণ্টা কখন পার হয়ে গেল। আমার জরুরি ফোনটাই বুঝি আর করা হবে না।



কবিরের কথা

আমি গিয়েছিলাম বাথরুমে। বাথরুম হচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় মহৎ চিন্তার সূতিকাগার। আমার কথায় যারা অরুচির ছাপ খুঁজে পাচ্ছেন এবং ভাবছেন আপত্তি করবেন, তাদের আমি আর্কিমিডিসের সূত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা ভদ্রলোকের মাথায় যখন পানির প্লবতা ধর্ম সম্পর্কিত বিখ্যাত সূত্রটি উদিত হয়, তখন তিনি কোথায় ছিলেন এবং তখন তার পরনে কী ছিল?

হ্যাঁ, আজ বাথরুমে গিয়ে যে বিখ্যাত চিন্তাটি আমার মাথায় এল, তা হলো, কালকের মেয়েটি, অত ভনিতারই বা কী দরকার, নাম ধরেই বলি, এমন না তো যে তার নাম আমি ভুলে গেছি, হৃদিতা, তিনি কেমন আছেন? মাথায় আঘাত, ডাক্তার কাল বলেছেন তেমন গুরুতর নয়, কিন্তু গুরুতর কিছু তো ঘটেও যেতে পারে। নাহ। তিনি কেমন আছেন, খুব জানতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। কারণ ফোন নম্বর রাখি নি এবং তিনিও রাখেন নি আমার নম্বর। এখন একমাত্র উপায় হলো তার বাসায় যাওয়া। সেটা সম্ভব নয়। একেবারে গায়ে-পড়া ব্যাপার হয়ে যাবে সেটা।

কিন্তু মন বলছে, আবার যোগাযোগ হবে। হবে কি?

দেওয়ালে একটা টিকটিকি টিকটিক করে উঠল। টিকটিকটিক। তার মানে যোগাযোগ হবে। বাবা টিকটিকি, যদি সত্যি সত্যি তার সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয়, তোকে একটা আস্ত মশা ধরে এনে খাওয়াব। বেচারা। ডেঙ্গুর কারণে জানালার মশার নেট বদলানো হয়েছে। তার খাদ্য-সংকট দেখা দিয়েছে। একটা যুদ্ধের যেমন অনেক অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু তুমি তো টিকটিক করেই খালাস। যোগাযোগটা হবে কীভাবে? হবে বলে চুপচাপ বসে থাকা পুরুষধর্ম হতে পারে না।

কিন্তু আমি কীইবা করতে পারি? একমাত্র অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে বসে থাকা ছাড়া।

বেশিক্ষণ বসে থাকতে হলো না। বাথরুম থেকে বেরুতে না বেরুতেই মা এগিয়ে এলেন। তার মুখ হাসি-হাসি এবং বোঝাই যাচ্ছে তিনি কিছু বলতে চান। আমি তার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালাম। তিনি বললেন, 'বুড়ো তোর একটা ফোন এসেছিল।'

বললাম, 'কে করেছিল, কিছু বলেছে?'

মা মুখটাকে আরো একটু হাসি-হাসি করে বললেন, 'একটা মেয়ে, নাম বলল হৃদিতা।'

আবার বুকের ভেতরটা যেন লাফিয়ে উঠল, কোনো একটা শ্যাওলা-ঢাকা নির্জন পুকুর পাড়ে গেলে যেমন হঠাৎ ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে পুকুরের পানিতে পড়ে। আমি চোখ সরু করে বললাম, 'হৃদিতা?' (মনে মনে, ও আমার সুইট মা! আম্মু তুমি লক্ষ্মী!)

'হ্যাঁ। মেয়েটা কিন্তু বেশ ভালো বাবা।'

'ভালো। তুমি কী করে বুঝলে?'

'কথা বললাম না। খুব মিষ্টি গলা।'

'গলা শুনেই বুঝে ফেললে মেয়ে ভালো।'

'শুধু গলা নয়, কথাবার্তাও বলল খুব ভালো। আদব-কায়দা জানে। কেমন খালাম্মা খালাম্মা করে কথা বলল।'

'খালাম্মা বললেই কেউ ভালো হয়ে যায়?'

'দ্যাখ বুড়ো। আমিও তো মেয়ে। বয়সও তো আমার কম না। আমি কিন্তু তোর চেয়ে অন্তত মেয়েদের ভালো বুঝব।'

'শুধু মেয়েদের কেন সব বিষয়েই তুমি ভালো বোঝো।'

'আমি ওকে আবার ফোন করতে বলেছি। ভালো মেয়ে, নিশ্চয় করবে।'

মা অন্যঘরের দিকে পা বাড়ালেন। এমন সময় ফোনের রিং বেজে উঠল। মা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'এই দেখ করেছে। নে, ধর।'

আমি হেসে বললাম, 'মা, তোমার ভাগ্নি! তুমিই ধরো।'

'আরে বাবা ধর না। কী মিষ্টি গলা।'

মার সারল্য চোখে পড়ার মতো। আমি সেদিকে একপলক তাকিয়ে এগিয়ে গেলাম ফোন ধরার জন্যে।

আমি বুঝতে পারলাম, মা দূরে আগ্রহ নিয়ে দেখছেন আর মিটিমিটি হাসছেন।

ফোনের রিসিভার তুলে বললাম, হ্যালো...

ওপাশ থেকে আওয়াজ এল, হ্যালো কাশেম ভাই, ভেড়ার পাল থাইকা একটা ভেড়া কই জানি ছুইটা গেছে গা...

ফোনটা কান থেকে সরিয়ে রাখলাম, দেখি মা এগিয়ে আসছেন, বললেন, 'কী? মিষ্টি গলা না?'

আমি ফোনের প্রেরক যন্ত্রে মুখ লাগিয়ে বললাম, 'নেন কথা বলেন।' তারপর মাকে বললাম, 'মা, কথা বলো। খুব মিষ্টি গলা।'

'আমি কেন বুড়ো, তুই কথা বলতে পারছিস না?' বলে মা এসে রিসিভার ধরলেন কানে। মা খানিক শুনে প্রথমে কিছুই বুঝলেন না, তারপর যখন বুঝলেন রং-নম্বর বলে ফোন রেখে আমার দিকে তেড়ে এলেন, 'বুড়ো তুই একটা না... তোর কপালে এ রকমই জুটবে।'

আমি হাসতে লাগলাম। মাও।

আবার রিং বেজে উঠল।

মা ধরলেন।

বললেন, 'হ্যালো...

'হ্যাঁ মা, ও বেরিয়েছে, নাও ধরো... ', ফোন ধরে আমাকে ডাকলেন, 'বুড়ো তোর ফোন।'

এগিয়ে গিয়ে ধরলাম ফোনটা।

অপর প্রান্ত বলল, 'হ্যালো আমি হৃদিতা, চিনতে পেরেছেন? ওই যে যার জীবন বাঁচিয়েছেন...

বললাম, 'জীবন বাঁচাই নি, একটা লিফ্ট দেওয়ার সুযোগ নিয়েছিলাম। লিফ্ট অবশ্য কোনো কম দামি জিনিস না বাই দা বাই, আমেরিকায় লিফ্টকে বলে এলিভেটর।'

'হিহি। আর সে সুযোগে আমার মহল্লা আপনাকে দিল উপযুক্ত পুরস্কার। আমি তখনও বারান্দা দিয়ে তাকিয়ে আছি আমার চোখের সামনে আপনার গাড়ির কাচ খুলে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আমি কিন্তু দৌড়ে বাইরে এসেছিলাম, ততক্ষণে আপনার গাড়ি অনেক দূর চলে গেছে।'

'সে কী? কেন? ওই অসুস্থ অবস্থায় আপনি কেন আবার বাইরে আসতে গেলেন?'

'এই হয়... যেচে কারো উপকার করতে নেই।'

'আপনার শরীর এখন ভালো তো?'

'হ্যাঁ। ভালো। কাল রাতে আব্বা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে আবার সিটি স্ক্যান করিয়েছেন। যাক রিপোর্ট ভালো।'

'যাক। আমি একটু দুশ্চিন্তাই করছিলাম। কেমন আছেন, না আছেন।'

'আপনাকে ফোন করেছি সরি বলার জন্যে। আপনি আমার যাকে বলে জীবন বাঁচানো তাই করলেন আর আমার বাড়ির সামনে আপনার গাড়ির কাচ গেল চুরি... কী যে লজ্জা পাচ্ছি... আমি রিয়েলি সরি।'

'না না এতে আপনার সরি হবার কী আছে, ফোন নম্বর কোথায় পেলেন?

'যোগাড় করেছি।'

'কেমন করে?'

'বুদ্ধি করে।'

'আপনার অনেক বুদ্ধি, না?'

'আরে আপনি এত বড় একজন আর্টিস্ট, আপনার ফোন নম্বর বের করা কী এমন কঠিন, যে কোনো গ্যালারিতে ফোন করলেই তো হয়।'

'বাহ্বা এত কষ্ট করলেন।'

'মোটেও কষ্ট করিনি, আমি আরো অনেক কষ্ট করতে পারি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমি আরো অনেক কষ্ট করার জন্যে সদা প্রস্তুত। স্কাউটদের মতো। হিহিহি।'

হাসল বটে, কিন্তু তার গলা কেমন দুঃখী দুঃখী শোনাচ্ছে। আমি প্রমাদ গুনলাম। একটা অল্প বয়সী মেয়ে অনেক দুঃখ পাবার জন্যে সদা প্রস্তুত থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মতো একটা ধেড়ে লোকের উচিত এ সমস্ত পথ এড়িয়ে চলা। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'শোনেন, আজকে আমি না একটু ব্যস্ত... আজ রাখি?'

তিনি বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে খোদা হাফেজ।' ফোন কিন্তু তিনি রাখছেন না। আমাকেই তাই রাখতে হলো।

ফোনের দিকে তাকিয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। বুকের গভীর থেকে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আসলেই আমরা কী চাই আমরা জানি না।

আসলেই আমি কী চাই আমি জানি না।

মা এলেন এক গ্লাস ট্যাং বানিয়ে নিয়ে, বললেন, 'কী রে রেখে দিলি, এত তাড়াতাড়ি গল্প হয়ে গেল?'

আমি মুখে হাসি এনে বললাম, 'হ্যাঁ মা, হয়ে গেল, ছোটগল্প।'

মাও হাসতে হাসতে বললেন, 'ছোটগল্প? তা হলে তো আশা আছে... শেষ হইয়াও হইল না শেষ।

আমি গ্লাসে চুমুক দিলাম। মা আমার খাওয়া দেখতে লাগলেন। ট্যাং। আমেরিকানরা উচ্চারণ করে ঠ্যাং। ঠ্যাং খাচ্ছি।

আমার খাওয়া হয়ে গেলে বললেন, 'মেয়েটা শুনতে তো ভারি মিষ্টি, দেখতে কেমন?'

আমি বললাম, 'দেখতে কেমন শুনতে কেমন এসব দিয়ে তুমি কী করবে?'

'আমি আবার কী করব? এমনি জিজ্ঞেস করলাম আর কী!' মা গ্লাস নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। গ্লাসের নিচে কিন্তু কিছু চিনি সব সময়ই অসম্পৃক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। আজো আছে। আঙুল ডুবিয়ে খেতে পারলে ভালো হতো।

কত কিছুই তো করতে সাধ হয়, করা কি যায়?

মনটা দমে গেল। কেন, ঠিক জানিও না।

ছবি আঁকার ঘরে গেলাম। ভালো লাগছে না কিছু।

বারান্দায়। না, তাও না।

শোবার ঘরে এসে কী মনে করে ডিকশনারি খুললাম। হৃদিতা শব্দের মানেটা জানা দরকার। নাহ্। ডিকশনারিতে নেই। হৃদয় অর্থে হৃদি আছে, হৃদিতা নেই। হৃদিই যদি বিশেষ্য হয়, তাতে তা দেবার কোনো দরকার পড়ে না।

হৃদিতা তাহলে বানানো শব্দ। জাস্ট এ প্রোপার নেম। মানে হয় না।

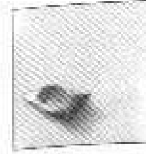
ডিকশনারি ওল্টাতে আমার ভালোই লাগে। অবসরে এ খেলা মন্দ নয়। হঠাৎ চোখে পড়ল, সুমন মানে পুষ্প। ফুল। আরে আরে কী আশ্চর্য। সুমন মানে তাহলে সুন্দর মন নয়?

তারো চেয়ে আশ্চর্য সুমনা মানে। সুমনা মানে জ্ঞানী, দেবতা।

তারো চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, সুমনা হলো পুরুষবাচক শব্দ, আর সুমন হলো স্ত্রীবাচক শব্দ। ঠিক দেখছি তো? রাজশেখর বসুর চলন্তিকা! এ অভিধান ভুল হতেই পারে না!

এ জন্যেই তো শেক্সপিয়ার সাহেব বলে গেছেন, নামে কি এসে যায়, গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তার সৌরভ সৌরভই থাকবে।

আর এ জন্যেই তো লোকে বলে, সাহেবদের কথা বাসী হোক, টাটকা হোক, ফলবেই। আরেকটা অভিধান দেখা যাক। নাহ্ এটাতে আবার *সুমন মানে সুন্দর মন* দেওয়া আছে! পৃথিবী বড়ই বিচিত্র। একেক ডিকশনারি একেক কথা বলে।



হৃদিতার কথা

দিনের মধ্যে একটা কাজ ছিল, টেলিফোন করা। তাও শেষ হয়ে গেল। এখন কী করব?

বাইরে যে কোথাও যাব, সেটাও ঠিক হবে না। ডাক্তার যখন বলেছেন রেস্ট নিতে, নেওয়াই উচিত। নাকি আবার অসুস্থ হলে আবার লিফট পাওয়া যাবে। তা হয়তো সব সময় যাবে না। (লিফটের অনেক দাম। আমেরিকায় লিফটকে বলে এলিভেটর। বার বার উনি লিফট দেবেন নাকি?)

শুয়েই রবীন্দ্রসংগীত শুনছি। আমি রবীন্দ্রসংগীতের ভক্ত নই। আশা ভোঁসলের কণ্ঠে বলেই শুনছি। টিভিতে তার হিন্দি গানের দৃশ্য দেখে দেখে তাকে আমার পছন্দ হয়েছে। ফলে তার গাওয়া গান রবীন্দ্রসংগীত হলেও এটা শ্রাব্য। এই গানটা তিনি আসলেই ভালো গেয়েছেন। সহে না যাতনা...

সহে না যাতনা
দিবসও গণিয়া গণিয়া বিরলে
নিশিদিন বসে আছি শুধু পথপানে চেয়ে–
সখা হে, এলে না।

চোখ বন্ধ করে গানটার মর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করছি। আমাদের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের পক্ষে এটা অনুভব করা সত্যি কঠিন। আমরা যাই ওপেন এয়ার কনসার্ট দেখতে। হইচই করি, নাচানাচি করি। জেমসের কণ্ঠে *লিখতে পারি না কোনো গান আজ তুমি ছাড়া* শুনলে আমাদের আসর হে গুরু করে ওঠে। এমনকি সুমনের *তোমাকে চাই* বা অঞ্জনের *চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা সত্যি* শুনলে আমাদের রক্তে শিহরণ জাগে। আমাদের সিনিয়ররা আমাদের বলেন বটে যে বয়স হোক, রবীন্দ্রসংগীতের মাজেজা বুঝবে, দেখবে তোমার মনের সব কথা তিনি বলে গেছেন, সে সব উপদেশ শুনলে মনে হয় কেউ বলছে, এখন বুঝছ না মরলে বুঝবে। কী যাচ্ছেতাই লাগে এ-সব ঠাণ্ডা সেকেলে ডায়লগ। তবুও বলতে পারি, *সহে না যাতনা* গানটা আমার ভালোই লাগছে। এই গানটা সম্পর্কে আমাদের ক্লাসমেট পল্লব কী বলে জানেন, এখানে কবি তাহার দাঁতের বেদনার কথা বলিয়াছেন। তিনি তাহার এক সখাকে দাঁতের ব্যথার ওষুধ আনিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সে আসিতেছে না। যাতনায়

কবি অস্থির। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। গানের শেষ প্যারায় কবি তাহাই বলিয়াছেন এইভাবে :

দিন যায় রাত যায়, সব যায়–
আমি বসে হায়!
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই–
শুকায়ে গিয়াছে আঁখিজল।
এক এক সব আশা ঝরে ঝরে পড়ে যায়–
সহে না যাতনা।

কিন্তু আজ সত্যি সত্যি গানটা আমার কানের ভেতর দিয়ে যেন বুকের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এ যেন আমারই অবস্থা।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙল ডোরবেলের টুংটাং আওয়াজে। মন্টি এল। তার হাতে একটা ক্রিকেট ব্যাট। ব্যাটটা সে আমার বিছানার নিচে রাখল। শূন্যে হাত ঘুরিয়ে সে একবার ব্যাট করছে, একবার বল করছে। আমার সামনে এসে সে বোঝার চেষ্টা করল আমি জেগে আছি, নাকি ঘুমিয়ে পড়েছি। জেগে আছি বুঝতে পেরে সে তার মিডিয়াম পেস বলটা ছুড়ল, 'আপা দশটা টাকা দেবে?'

'কেন টাকা দিয়ে কী করবি?'

'কোল্ড ড্রিংকস কিনব। ড্রিংকসটা তুমিই খেয়ো। পুরোটাই।'

'তাহলে কিনতে চাচ্ছিস কেন?'

'ড্রিংসের সঙ্গে একটা শচীন টেন্ডুলকারের কার্ড পাওয়া যাবে।'

'যা ভাগ। তোর কার্ডের অভাব পড়েছে। নাকি শচীনের কোনো পোস্টার ভিউকার্ড তোর নাই। হোম ওয়ার্ক করেছিস?'

'আপা, তুমি যে কী না, টাকা দেবে না, না দাও, এর মধ্যে আবার পড়ার কথা কেন? শোনো শুধু কার্ড না, একটা স্লোগান লিখে পাঠাতে হবে, লেগে গেলে বিনা পয়সায় কলকাতায় নিয়ে যাবে, খেলোয়াড়দের সাথে একই হোটেলে রাখবে, এটা শুধু ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে।'

'তাই নাকি?'

'জি, তাই। দাও দশ টাকা।'

'দে ব্যাগটা দে, মন্টি শোন।'

'বলো।'

'আচ্ছা, আমাদের বাসার সামনে থেকে গাড়ির পার্টস খুলে নিয়ে যেতে পারে , ছেলেটা কে?'

'তোমার প্রবলেমটা কী খুলে বলো তো।'

'ওই যে বললাম না একজন আর্টিস্ট আমাকে কালকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন, ওনার গাড়ির একটা গ্লাস না এক দৌড়ে একটা ছেলে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেলো।'

'আমাদের বয়সী ছেলে?'

'হুঁ।'

'ঠিক আছে ব্যাপারটা আমি টেকআপ করলাম।'

'না না গাড়ির পার্টস চুরির সাথে বড় গ্যাং থাকে... তোকে কিছু করতে হবে না।' টুংটাং। ডোরবেল বেজে উঠল। মন্টি গিয়ে গেট খুলল। মা ঢুকলেন। সেটা বোঝা গেল তার বকবকানিতে, তিনি বলে চলেছেন, 'উফ আর পারি না। এতগুলো বাসায় যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা। মুখ ব্যথা হয়ে গেল।'

মন্টি বলল, 'মা, তুমি তো গেছ পায়ে হেঁটে, তোমার মুখ ব্যথা হল কেন?' মা বললেন, 'আর বলিস না মন্টি। এই বিল্ডিংয়ের সব বাসায় যাওয়া। পায়েও ব্যথা হয়েছে। আবার সব বাসায় গিয়ে একই কথা বলতে হলো।'

মন্টি বলল, 'কী কথা?'

'এই যে হৃদিতার এক্সিডেন্টের খবরটা। এত বড় খবর পাড়াপড়শিদের না জানালে কি চলে? জানিয়ে এলাম।'

এ ঘর থেকে মা'র কথা শুনে আমি আঁতকে উঠলাম। গলা বাড়িয়ে বললাম, 'কী জানালে?'

মা বেশ আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বললেন, 'তাই তো বলছি। মুখ কি আর সাধে ব্যথা হলো? প্রত্যেক বাসায় গিয়ে বললাম, শুনেছেন, আমাদের হৃদিতা তো বিরাট এক্সিডেন্ট করেছে। বেবিট্যাক্সির ভেতরে একেবারে অজ্ঞান।' মা এ ঘরে এগিয়ে এলেন।

'লোকে জিজ্ঞেস করলো না কেন অজ্ঞান হলো?'

'করেছে। ওই তো ৬ নম্বরের মেজ বউ বললো, হৃদিতার কি ফিটের অসুখ আছে। বউটা ভালো না। ফিটের অসুখ ও পেল কোথায়?'

'তুমি কী বললে?'

'বললাম, কক্ষনো না। হৃদির কোনোদিনও ফিটের অসুখ-টসুখ ছিল না। সব বেবিট্যাক্সির দোষ। টু স্ট্রোক ইঞ্জিনে বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ে।'

'মা, তুমি এত কঠিন কথা বলতে পারলে?'

'আমি পারলাম, কিন্তু মূর্খ বউটা বুঝল না... সে বলে কী, স্ট্রোক করেছে হৃদিতা স্ট্রোক করেছে... আমি বলি আরে না টু স্ট্রোক ইঞ্জিন না ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের বেবি দরকার।'

মন্টি বলল, 'মা, তুমি এসব জানলে কী করে?'

মা বললেন, 'তোর মেজ মামা বলল। তাই শুনে...'

আমার এবার সত্যিকারের বিস্ময় মানবার পালা। মেজ মামাকেও বলা শেষ। মাথায় হাত দিয়ে বলি, 'তা তোমার লেকচার শুনে ওনারা কী বললেন?'

মা নির্দোষ ভঙ্গিতে বললেন, 'আরে ওদের ভালো কথায় উৎসাহ আছে নাকি, সবাই খালি জানতে চায়, হৃদিতাকে হাসপাতালে নিল কে? জিজ্ঞেস করে... না থাক...ওটা বলা যাবে না।'

আমার খুবই বিরক্তি লাগছে। ক্ষেপে গিয়ে বললাম, 'না, বলা যাবে না কেন, বলো, এমন পাগল মহিলা আমি জীবনে দেখি নি। সারা পাড়ায় উনি ঢোল পিটিয়ে এলেন আমার মেয়ে রাস্তায় সেন্সলেস হয়ে পড়েছিল...বোকামি দেখলে গা জ্বলে যায়।'

মা বললেন, 'শোন হৃদি, কাল বিকেলে তুই ঘরে শুয়ে থাকবি, তোর মামা খালারা তোকে দেখতে আসবে।'

কী রকম কথা। মেজাজ কি ঠিক রাখা যায়? বললাম, 'কী...এখন আমাকে রোগী হয়ে শুয়ে থাকতে হবে আর সবাই আমাকে কমলা বেদানা নিয়ে দেখতে আসবে?'

মা নির্বিকার, 'হ্যাঁ। আমি সবাইকে আসতে বলেছি।'

'তুমি কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকো আমি বাড়ি ছেড়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যাবো।'

মা অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, 'মা হৃদি, আমার প্রেস্টিজ। বড় ভাবির মুখ তো তুই জানিস। এসে যদি তোকে না দেখে, কতো কথা শুনিয়ে যাবে।'

বললাম, 'তাহলে যদি তোমার আক্কেল হয়।'

মা নরম স্বরে, সম্ভবত আমাকেও নরম করার জন্যে বললেন, 'শোন তুই চাইলে তোর ওই আর্টিস্ট সাহেবকেও দাওয়াত করতে পারিস।'

আমি কাঁদ কাঁদ সুরে বললাম, 'আমার ওই পাগলামিটাই তো কেবল বাকি আছে, যাও তো মা চোখের সামনে থেকে, উফ্ গা জ্বলে যাচ্ছে...

মা'র এই একটা ব্যাপার আছে। সব বিষয়ে আত্মীয়-স্বজনদের জড়ো করতে চাওয়া। তিনি নিজে তো সবাইকে সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল রাখবেনই, চাইবেন, তার আত্মীয়-স্বজনরাও তাকে সার্বক্ষণিক অবহিত রাখুক। কোনো বিষয়ে যদি তিনি টের পান যে তাকে জানানো হয়নি, তবে আকাশ মাথায় তুলে ছাড়বেন। আসলে মা এখনও সেকেলে মানুষই রয়ে গেছে। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন এই ধারণাগুলোকে এখনও মূল্যবান মনে করেন। জগত যে বদলে যাচ্ছে, জীবন যে এখন ব্যস্ত, এখন কারো যে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর সময় নেই, এটা তারা বোঝেনও না। বুঝতে চানও না। বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতি দেখলে মন খারাপ করেন।

আরো একটা দিন চলে গেল। এলো আরেকটা নতুন দিন। আজ আমাদের বাসায় উন্নত মানের খাবার রান্না হচ্ছে। সকালবেলা মা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার গিয়ে নিজে মুরগি, পোলাওয়ের চাল, ইলিশ মাছ ইত্যাদি কিনে এনেছেন। সত্যি সত্যি মামা-খালা-ফুপু যারা আছেন এ শহরে, তাদের দাওয়াত। উপলক্ষটা অবশ্য অস্বস্তিদায়ক, আমার এক্সিডেন্ট। মা'র আশা, আমি বিছানায় শুয়ে থাকি। আমি উঠে রান্নাঘরে গেলাম। ফতে মশলা পিষছে।

মা আমাকে দেখেই আঁতকে উঠলেন, 'মা হৃদি, তুই কেন এসেছিস? যা যা এই

শরীর নিয়ে, মাথায় আঘাত, মোটেও হেলাফেলা করা উচিত নয়।'

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, 'মা, গেস্টদের আসতে অনেক দেরি আছে। এখন আমি একটু বরং তোমাদের সাহায্য করি। বিকাল হওয়ার আগেই শুয়ে পড়ব।'

ওপাশ থেকে মন্টি ফোঁড়ন কাটল, 'আর আমি তোমার জন্যে চমৎকার জাপানি পতাকা বানিয়ে দেব।'

বললাম, 'মানে?'

'মানে হলো সিনেমায় দেখো না, নায়িকারা এক্সিডেন্ট করলেই মাথায় একটা সাদা ব্যান্ডেজ পরে। সাদার মধ্যে ঠিক মাঝখানে থাকে একটা লাল গোল। ঠিক যেন জাপানি পতাকা। সূর্যোদয়ের দেশে সূর্যোদয় হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'না, তার দরকার পড়বে না। মা, আমি তোমাকে বরং পুডিং বানিয়ে দেই। খাওয়ার পরে ডেজার্ট দিতে হবে না।'

'দিবি। দে'– মা বললেন, 'থাক লাগবে না। ওরা কেউ দই-মিষ্টি আনবে না।'

'মনে হয় না। ওরা আনবে আঙুর বেদানা, বড়জোর হরলিক্স। মিষ্টি আইটেম তোমাকে মা একটা বানাতে হবেই।'

'আচ্ছা, বানা, পুডিং বানা। শখ যখন করেছিস।'

পুডিং চুলায় আঁচে দিয়ে এসে নিজের ঘরে ফ্যানের নিচে বসলাম। কাজটা আমি বেছে নিয়েছি স্বেচ্ছায়। কারণ মনটা খুব অস্থির। যাকে বলে উড়ু উড়ু। কেবলই কাছে টানছে টেলিফোনটা। মনে হচ্ছে, যাই ভদ্রলোককে একটা ফোন করি। কিন্তু ফোন করে কী বলব? কোনো কথা তো থাকতে হবে। মাকে কাল বকেছি, বলেছি, ফোন জিনিসটা হচ্ছে জরুরি বার্তা জানানোর জন্যে। কুমড়ার মোরব্বার রন্ধন-প্রণালী আলোচনার জন্যে নয়।

একটা ভালো পয়েন্ট মনে পড়েছে। তাঁকে ফোন করে তো আমি বলতে পারি যে আজ তারও দাওয়াত ছিল। কিন্তু আমি চাই না আজ তিনি আসুন। আজ বড় ভিড় হবে বাসায়। ফোন করব? যদি তিনি কিছু মনে করেন? কী আর মনে করবেন? আমার যে ফোন করতে ইচ্ছা করছে!

অজান্তে হাত চলে গেল ফোনের কাছে। রিসিভার হাতে উঠে এল। তার ফোন নম্বরটা লেখা আছে ফোনের পাশে রাখা টেলিফোন নম্বরের নোট বইটার ভেতরের মলাটে। বের করে ডিজিট টিপলাম।

'হ্যালো।' ওপাশ থেকে সেই কণ্ঠস্বর।

'হ্যালো, আমি হৃদিতা।'

'জি বলুন।'

'আপনাকে ফোন করলাম আমার মা'র পক্ষ থেকে। মা বলছিলেন আপনাকে একদিন বাসায় আনতে। আজকে আমাদের বাসায় লোকজন আসছে আমাকে দেখতে...।'

'দেখতে মানে, পাত্রপক্ষ?'

'না না। আমি এত বড় একটা এক্সিডেন্ট করলাম, সে জন্যে সবাই আমাকে দেখতে আসবে। বাসায় ভালো রান্না হচ্ছে। মা বলছিলেন আপনিও যদি আসতেন।'

'না না, দরকার নেই।'

'আমিও আজ আপনাকে আনতে চাই না এই ভিড়ের মধ্যে। আপনি নিশ্চয় ভিড় পছন্দ করেন না।'

'না, করি না।'

'আমিও তাই ভেবেছি। আমার ভিড়ভাট্টা পছন্দ নয়। আপনাকে একদিন বাসায় আনব। শুধু আপনাকে।'

'শোনেন, আমি একটা ছবিতে কেবল রং চড়িয়েছি, আজকে রাখি?'

'সরি। সরি। আপনার ছবি আঁকার সময় ডিস্টার্ব করলাম। ঠিক আছে, খোদা হাফেজ।'

ফোনটা রেখে দিলাম। মনটা দমে রইল। ভদ্রলোক কি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে। নাকি সত্যি ছবি আঁকছিলেন? ছবিতে রং চড়ালে কি তাড়াতাড়ি করে ছবির কাছে ফিরতে হয়?

নাহ। কিচ্ছু ভালো লাগে না। কিচ্ছু না।

এর মধ্যে আবার বাসায় ভিড় হবে? আমাকে সং সাজতে হবে। সব রাগ গিয়ে পড়ে মা'র ওপরে। যদি এখন মা'র সাথে একটা ঝগড়া বাধিয়ে বসতে পারতাম।

ফোন বেজে উঠল। ধরলাম।

'হ্যালো। হৃদি।'

'নাসরিন? বল।'

'কী ব্যাপার, ক্লাসে আসছিস না যে?'

'আর বলিস না। পরশু একটা এক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। স্কুটারে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। সে জন্যে রেস্ট নিচ্ছি।'

'বলিস কী? কেমন করে?'

'হঠাৎ ব্রেক করেছে। মাথা গিয়ে লেগেছে রডে। তার মধ্যে যে ধোঁয়া।'

'তারপর?'

'তারপর কিচ্ছু মনে নাই। জ্ঞান ফিরলে দেখি হাসপাতালে।'

'হোয়াট অ্যান এডভেঞ্চার! ইস আমার জীবনে শালা কিচ্ছু ঘটে না। এই তোকে হাসপাতালে দিয়ে গেল কে? স্কুটারঅলা?'

'না, সেটা বলা যাবে না, নাসরিন। তবে এটা সিয়োর যে স্কুটারঅলা না।'

'এই বল না, কে? শোনার জন্যে আমার পেট ফেটে যাচ্ছে।'

'যখন বলার, নিশ্চয় বলব। নাসরিন, এক কাজ করতে পারবি, আমার সঙ্গে একটু এক জায়গায় যেতে পারবি।'

'কোথায়?'

একটা আর্ট গ্যালারিতে।'

'কেন? কোনো একজিবিশন আছে?'

'হ্যাঁ। আছে।'

'কার?'

'সে তো গেলেই দেখতে পাবি।'

'ঠিক আছে। কখন?'

'এখনই আয়।'

নাসরিন চলে আসে আধঘণ্টার মধ্যে। আমরা দুজনে বের হবো। আমি তৈরি হচ্ছি।

মা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। 'হৃদি, দেখিস মা, আমার মুখটা রাখিস। অবশ্যই তাড়াতাড়ি ফিরবি।'

আমি বললাম, 'মা, একদমই চিন্তা কোরো না। খালি যাব আর আসব।'

বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাসার সামনে নেমে দেখতে পেলাম মন্টিকে। কী যেন করছে?

বললাম, 'এই মন্টি, কী করছিস?'

'আপা। তোমার গাড়ির আয়না চুরির ঘটনা তদন্ত করছি। আপা গাড়িটা এই দিকে মুখ করা ছিল নাকি ওই দিকে?'

'তার সাথে চোর ধরার কী সম্পর্ক?'

'এখন বলা যাচ্ছে না। তবে পরে এই ডাটাগুলো কাজে লাগতে পারে। তুমি ফেলুদার বইয়ে পড়ো নি?'

'আ রে আমার ফেলুদা এসেছেন রে...যা বাসায় যা, পড়তে বস।'

'এর মধ্যে আবার পড়ার কথা আসে কোত্থেকে? দাঁড়াও যখন তদন্তটা শেষ করে একটা বিরাট গ্যাংকে ধরে ফেলব, তখন তুমিই এসে বলবে, আমার ভাই আমার গর্ব। ওরে বাবা রে ওরে মারে।'

সহসা চিৎকার।

কী হলো? এই মন্টি।

ব্যাপার বুঝতে খানিক সময় লাগল। কে যেন ওপর থেকে ময়লার ব্যাগ ফেলেছে। পড়বি তো পড়, একবারে মন্টি গোয়েন্দার মাথায়। ভাগ্যি কোনো ভারি কিছু ছিল না। অনেকখানি বাদামের খোসা ছিল। আর কিছু মাছের আঁশ-কাঁটা ইত্যাদি।

নাসরিন ফিক করে হেসে দিল।

ভয় কেটে গেছে মন্টির, কিন্তু এখন সে বোধ করছে অপমান। 'দাঁড়াও, অন্তত

বাদামের খোসা কে ফেলেছে, এটা যদি আমি বের করতে না পারি, তাহলে আমার নাম মন্টিই নয়।'

নাসরিন বলল, 'তাহলে তোমার নাম দেব ঘন্টি, রাজি।'

রিকশায় যাচ্ছি দুজন। আমি আর নাসরিন। নাসরিন আবার আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মুখ-আলগা মেয়ে। তার মুখে কিছুই আটকায় না। সে বলল, 'তুই অজ্ঞান হয়ে হসপাতালে গেলি, অথচ তোর কিছুই হারায় নি?'

আমি বললাম, 'না, কিছুই হারায় নি। এক ভদ্রলোক তার গাড়িতে করে নিয়ে গেছেন তো!'

সে ফিসফিস করে বলল, 'বাসায় এসে ঠিকভাবে চেক করেছিস তো, সব পার্টস ঠিকঠাক ছিল তো?'

উফ্। নাসরিন। চুপ!!

ওরিয়েন্টাল গ্যালারি ধানমণ্ডিতেই। খুঁজে পেতে তেমন অসুবিধা হলো না। বেশ সুন্দর করে সাজানো। সামনের দেওয়ালজুড়ে পোড়া মাটির কাজ। কারুকার্যময় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই এসির ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগল। গান বাজছে। একজন মহিলা শিল্পী প্রচুর শ্বাস মিশিয়ে গাইছেন। হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায় হায় সজনী। আমরা পা টিপে টিপে গেলাম রিসেপশনে। সেটা আবার একটা বিক্রয়কেন্দ্রও। বললাম, 'আচ্ছা, কিছুদিন আগে আপনাদের এখানে এক্জিবিশন হয়েছিল কবিরুল ইসলামের, ওনার ক্যাটালগ, সুভেনির কিছু আছে?'

'আছে?'

'কত দাম?'

'ক্যাটালগ ২০ টাকা, সুভেনির ৫০ টাকা।'

'দেন।'

'কী ব্যাপার? ছবি কিনবি?' নাসরিনের চোখে মুখে বিস্ময়।

'হ্যাঁ।'

'তুই? হৃদি?'

'কেন? আমি ছবি কিনতে পারি না?' আমি বললাম।

সুন্দর পোশাক-পরা টাইধারী রিসেপশনিস্ট কাম বিক্রেতা বললেন, 'কিনলে আমাদের কাছ থেকে কিনবেন। কনসেশন করে দিতে পারব?'

'কিনলে আপনাদের কাছ থেকেই কিনব।' আমি পার্স খুলে দাম দিতে দিতে বললাম।

নাসরিন ক্যাটালগ ওল্টাচ্ছে। শেষে তার চোখ পড়ল আর্টিস্টের ছবির ওপরে। সেল্‌সম্যানকে বলল, 'এটার দাম কত?'

তিনি বললেন, 'ওটা পেইন্টিং নয়। আর্টিস্টের ফটো।'

নাসরিন হাসল। বেরিয়ে আসার জন্যে দরজা ঠেলা দিতে দিতে আমাকে বলল,

'আমার তো আর্টিস্টকেই পছন্দ হয়েছে। একবারে উত্তম কুমার। বিক্রি হলে আমি তাকেই কিনতাম।'

আমি মনে মনে বললাম, ভালো জিনিসে সবার চোখ পড়বেই। নাসরিনের যখন চোখে ধরেছে, তখন আমি পছন্দ খারাপ করিনি।

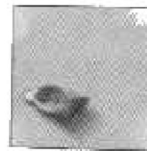
প্রকাশ্যে বললাম, 'নো নাসরিন, ইউ শুড নট সে লাইক দিস। এন আর্টিস্ট ইজ নো কমোডিটি। কাজ শেষ। ভীষণ রোদ। এখন চল বাসায় যাই।'

'না, কেন, এত তাড়াতাড়ি বাসায় যাব কীরে? রোদে রোদে ঘুরব। আমার স্কিন ট্যান করা দরকার। দেখতে আমাকে কেমন শ্বেতী রোগী রোগী লাগে না?'

'ইস। বলল একটা কথা। রং ভালো পেয়েছিস তো। তাই। আমার বাবা চামড়া পোড়ানোর কোনো ইচ্ছা নাই। পরে কে আবার ফেয়ার এন্ড লাভলি ব্যবহার করতে যাবে।'

আমার ইচ্ছেটা হলো বাসায় গিয়ে ক্যাটালগ-ফোল্ডার ভালোমতো রিসার্চ করব। তার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকব। আমার অবস্থা এখন এ-রকম : তাহার দুটি পালন করা ভেড়া, যখন চাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া কোলের পরে নেই তাহারে তুলে।

আমার এখন দরকার একাকীত্ব, দরকার নিভৃতি। আমি একলা হলেই কেবল তাকে পাব, ভাবনায়, কল্পনায়, আকাশ-কুসুম চয়নে।



কবিরের কথা

ছবি আঁকছি। ওয়াটার কালার। মিনিয়েচার। মিনিয়েচার হওয়ায় জলরঙের যে স্বাধীনতা আর স্বতঃস্ফূর্ততা আর দ্রুততার সুবিধা পাওয়ার কথা, তা কম পাওয়া যাচ্ছে। বরং একটা ছোট্ট সোনার গয়নায় যেমন বহু সূক্ষ্ম কারুকাজ থাকে, তেমনি ছোট ছোট ডিটেইলের কাজ করার চেষ্টা করছি। জানি না, আদৌ কিছু হচ্ছে কিনা।

তবে এক ধরনের প্রেরণা পাচ্ছি, নিজের ভেতর থেকেই। মনে হচ্ছে, কোথায় যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে গেছে। জানি না কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।

হৃদিতা মেয়েটা আরো দুবার ফোন করেছিলেন। এটা-ওটা জিজ্ঞেস করেছেন। কখন ছবি আঁকি, দেশে কার কার ছবি পছন্দ করি, প্রিয় রং কী– এ-সব প্রশ্ন। প্রশ্ন শুনেই বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা আমাকে পছন্দ করে। তিনি আমাকে পছন্দ করেন কি করেন না, এটাও বড় প্রশ্ন নয়, আসলে তাঁকে আমার খুব ভালো লেগে গিয়েছে। সেটা

খুব বিপজ্জনক। এভাবে কথা বলতে থাকলে এক সময় আমি তার সুতোয় জড়িয়ে যাব। আর তার যদি কোনো সুতো নাও থাকে, তাহলে নিজে সুতো ছাড়ব। তাকে জড়িয়ে ফেলব। তার বয়স কম। তাকে পটানো, ইংরেজিতে যাকে বলে সিডিউস করা, খুব কঠিন কোনো ব্যাপার হবে না। নারী-পুরুষের সম্পর্কটাই এ রকম, এক সময় পরস্পর পরস্পরকে অপ্রতিরোধ্যভাবে কাছে টানতে থাকে, জড়িয়ে ধরে, আঁকড়ে ধরে, তখন আর কারো কিছু করার সময় থাকে না, সুযোগ থাকে না। আমি বালক নই। রফিক আজাদের কবিতা আছে :

বালক ভুল করে নেমেছে ভুল জলে
বালক ভুল করে পড়েছে ভুল বই
পড়ে নি ব্যাকরণ পড়ে নি মূল বই
বালক জানে না তো কতটা পথ গেলে
ফেরার পথ আর থাকে না কোনোকালে

আমার পক্ষে এমন কোনো কিছু করা উচিত হবে না, যাতে আমি আর ফিরতে না পারি। আমার পক্ষে এমন কোনো কিছুকে প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত হবে না, যাতে তিনি তার শেকড় উপড়ে ফেলে উন্মূল হয়ে আমার জমিতে আশ্রয় চান। আমার বয়স বেশি, অভিজ্ঞতা বেশি। আমার দায়িত্বও বেশি। কিছু যদি ত্যাগ করতে হয়, সে আমাকেই করতে হবে। আমি তাই তার সঙ্গে টেলিফোনালাপে তেমন উৎসাহ দেখাই নি। সত্যি কথা বলতে কী, আমি তার উৎসাহে খানিক ঠাণ্ডা জলই ছিটিয়ে দিয়েছি।

কারো সাথে খারাপ ব্যবহার তো আমি করতে পারি না। সাধারণত না। কিন্তু তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের একটা ভঙ্গি করতে হয়েছে। তিনি ফোন রেখে দিয়েছেন। আমি জানি তার মন খারাপ হয়েছে। কিন্তু আমারও কি মন খারাপ হয়নি? তিনি সেটা জানবেন না। তিনি হয়তো ভাববেন, কবিরুল ইসলাম লোকটা ভীষণ মুডি। হয়তো ভাববেন, মানুষটা চোয়াড়ে। মন খারাপ করে একটা তরুণী বসে আছে নিজের ঘরে, বাসার কারো সঙ্গে কথা বলতে পারছে না, এই অপমান সে কারো সাথে ভাগও করতে পারছে না, তার শুধু কান গরম হচ্ছে, দু'কান দিয়ে গরম বাষ্প বের হচ্ছে, এটা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি কী করতে পারি? সুনীলের একটা কবিতা আছে না, আমি এমনভাবে পা ফেলি যেন মাটির বুকেও আঘাত না লাগে, আমার তো কারুকে দুঃখ দেবার কথা নয়।

ছোট্ট একটা স্পেস তুলির ডগায় পানি দিয়ে ভরে দিলাম, এবার এক ফোঁটা রং লাগাব, আর জলে রংটা ছড়িয়ে পড়বে টি-ব্যাগ চুয়ে বের হওয়া চায়ের মতো, মেঘের মতো ছড়াবে রং, জলরঙের এ পুরোনো ম্যাজিকটা আমার খুবই মজার লাগে। আই রিয়েলি এনজয় দিস ম্যাজিকাল মোমেন্ট।

মা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়ালই করি নি। ছবিটা কিছুটা হয়ে গেলে একটু পেছনে এসে দেখছি, কেমন হলো।

হঠাৎ দেখলাম, মা নীরবে দাঁড়িয়ে।

বললাম, 'মা কিছু বলবে?'

'না বুড়ো। তুই আঁক।'

'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলবে। বলে ফেলো।'

'ওই যে মেয়েটা– হৃদিতা– ওতো আর ফোনটোন করছে না।'

'করার তো কথা না মা।'

'তোর কাছে ওর ফোন নম্বর আছে?'

'কেন?'

'একা একা থাকি। মাঝে মধ্যে গল্পগুজব করলে ভালোই লাগত।'

'ফোন নম্বর নাই মা।'

'ও আচ্ছা, ঠিক আছে, যাই।' মা চলে যান, তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন, 'শোন এবার ফোন করলে ওর নম্বরটা নিয়ে রাখিস তো।'

আমি শুধু হাসলাম। কিছু বললাম না। মায়ের মন তো! আমার মায়াই লাগে। একটা দীর্ঘশ্বাস আমার বুক ভেঙে বেরিয়ে এল।

বেশ কিছুদিন হৃদিতার কোনো ফোনটোন নেই। খারাপ লাগছে। এখন মনে হচ্ছে, মা'র কথা শুনলেই হতো। তার টেলিফোন নম্বর যোগাড় করে রাখাটা উচিত ছিল। একটা ফোন করে খোঁজ-খবর করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। আর ফোনে কথাবার্তা হলেই একজন আরেকজনের প্রেমে পড়ে যায় না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক অগ্রসর। আমাদের কালের মতো খ্যাত্ নয়। তারা একসঙ্গে হইচই করে, পইপই করে, আউটিঙে যায়। গাঁজা-টাজাও খায়। কিন্তু প্রেমে পড়ে না। তাদের কাছে, বন্ধু হলো বন্ধু। প্রেমিক হলো প্রেমিক।

আসলে সমস্যা আমার মনে। তার মনে নয়। একজন শিল্পীর প্রতি যে কেউ আকৃষ্ট হতে পারে। এটা তার শিল্পিতারই অংশ। এর মানে এই নয় সে ব্যক্তি মানুষটার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে। আসলে সে অনুরাগী শিল্পের।

সাধারণত বাইরে বেরুনো হয় না। ঘরেই থাকি। এ-ধরনের নানা কথা মনে হয়।

আজ ঘুম ভাঙল ভোরে। আজকের দিনটা একটা বিশেষ দিন। আজকের সূর্যোদয়টা আমি দেখতে চাই। ছাদে উঠলাম। বেশ কুয়াশা পড়ে তো। এখনও আশপাশের লাইটগুলো জ্বলছে। বিবর্ণ একেকটা বাতি। ছাদে একটা খবরের কাগজের টুকরা ভেজা ভেজা হয়ে আছে।

কাল রাতে শুয়েছি একটু বেশি রাতে। ১২টার সময় ফোন বেজে উঠল। ভেবেছিলাম হৃদিতা। নাহ। *ওরিয়েন্টাল গ্যালারি*র মালিক আর তার স্ত্রী মালা ভাবি। ওরা আমার জন্মদিনে উইশ করল। আর জন্মদিন! ৩৮ বছর চলে গেল। মা আমার জন্যে ফিরনি রেঁধে রেখেছেন। ১২টার সময় তিনি দরজায় এসে হাজির। ফোন রেখে

মা'র কাছে গেলাম, মা'র হাত ধরে নিয়ে এলাম ঘরে। মা আমার মুখে এক চামচ ফিরনি তুলে দিয়ে কপালে চুমু খেলেন। হ্যাপি বার্থ টু ইউ বুড়ো।

আমি বললাম, 'মা, আজ কিন্তু আমি সত্যি সত্যি বুড়ো হয়ে গেলাম। আরো এক স্পেল বল হয়ে গেল। স্টিল নট আউট।' মা করুণ করে হাসলেন।

আমি মা'র কপালে একটা চুমু দিলাম। তারপর মা ছেলে চুপচাপ বসে রইলাম খানিকক্ষণ। এত চুপচাপ যে ডাইনিং স্পেসে রাখা ফ্রিজের শব্দও আমার কানে আসতে লাগল।

রাতে শুয়ে ভাবছিলাম, হৃদিতা ফোন করলে কিন্তু মন্দ হতো না।

ছাদে হাঁটতে মন্দ লাগছে না। আর দেখো কাকগুলো ঠিকই জেগে উঠেছে। চোখ বন্ধ করে মন কেন্দ্রীভূত করে শুনতে চাইলে পাখির কলকাকলিও শোনা যাচ্ছে। কাল কাগজে দেখে নিয়েছি, আজকের সূর্যোদয় ৬টা ১১ মিনিটে।

চারদিক খুব দ্রুত ফরসা হচ্ছে। এখন আকাশ অনেক পরিষ্কার।

সূর্যোদয় ঠিকভাবে একতলার ছাদ থেকে দেখা যাবে না। দিগন্ত ঢাকা চারদিকের বিল্ডিংয়ে। ৬টা ১৫ মিনিটে রোদ এসে পড়ল ছাদে। এক ফাঁক দিয়ে। আমার জন্মদিনের সূর্য, তার আলো। রোদ গায়ে মেখে ঘরে ফিরে এলাম।

ক্লান্তি লাগছে। আবার শুয়ে পড়লাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল মা'র ডাকে। মা বললেন, 'বুড়ো ওঠ। তোর জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।'

আমি চোখ রগড়ে উঠলাম। চোখে-মুখে পানি দিয়ে এলাম।

মা বললেন, 'শোয়ার কাপড়টা বদলে নে।'

চারদিকে অনেক আলো। দশটা দশ বাজে। আমি পাজামা বদলে একটা ট্রাউজার পরে ওপরে চাপালাম একটা টি-শার্ট। 'আয়, বসবার ঘরে আয়।' মা বললেন।

সত্যিই এটা একটা বড় সারপ্রাইজ। বসার ঘরে বসে আছেন হৃদিতা। শাড়ি পরা। সবুজ শাড়ি। কমলা ব্লাউজ। গলায়, কানে মাটির গয়না। তাকে লাগছে অপ্সরার মতো। সামনে টেবিলে একটা বাঁশের ঝুড়িতে অনেকগুলো গোলাপ। লাল রঙের গোলাপ।

আমাকে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।'

থ্যাংক ইউ বলে বসলাম। আমার ঘুমের ঘোর না কাটতেই বিস্ময়ের ঘোরের পালা।

হৃদিতা কি গোলাপের পারফিউম গায়ে মেখে এসেছে? নাকি তার আনা গোলাপের গন্ধ এসব।

মা বললেন, 'চা খাবে? না কি ঠাণ্ডা কিছু?'

হৃদিতা হেসে বলল, 'যা খাওয়াবেন খালাম্মা। শুধু ঝামেলা করতে পারবেন না।'

দুজনে খানিকক্ষণ নীরব হয়ে বসে রইলাম। তারপর বললাম, 'আজকে আমার বার্থ ডে, আপনাকে কে বলল?'

'জানতে চাইলে জানাটা কি কঠিন?'

'মা বলেছিল?'

'না।'

'তাহলে?'

'আছে। আজকে না। আরেকদিন বলব।'

'না না আজকেই বলেন।'

'এক্জিবিশনের সুভেনিরে।'

'আমার এক্জিবিশনের সুভেনির আপনার কাছে আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। আছে।'

'আপনি কি ছবি দেখতে যান?'

'যাই। ছবির অবশ্য আমি কিছু বুঝি না। শুধু তাকিয়ে থাকি। কোনো ছবিকে মনে হয় ঠাণ্ডা। কোনো ছবিকে মনে হয় মিষ্টি। কোনোটাকে রাগী। এই আমার ছবি বোঝার দৌড়।'

আমি চমকে উঠলাম। ছবি বোঝা ব্যাপারটা তো আসলে তাই। একটা অনুভূতি। একটা ইমপ্রেশন। তার সঙ্গে হয়তো যুক্ত হয় অনেক ছবি দেখার অভিজ্ঞতা, হয়তো কোনো মোটিফের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য, কোনো মিথ, বা মিথ ভেঙে ফেলা...তবে অনুভূতিটাই আসল। বললাম, 'বলেন কী? ছবির বোঝার ব্যাপারটা তো এই-ই। আপনি তো রীতিমতো বোদ্ধা।'

'আপনার ঘরে আর ছবি নাই?'

'আছে।'

'দেখা যাবে?'

'যাবে। দেখবেন?'

'হুঁ।'

'চলেন।'

তাকে নিয়ে এলাম আমার ছবি আঁকার ঘরে। বেশ কিছু ছবি দেওয়ালে টাঙানো ছিল। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। বললেন, 'এ ছবিটা তো আপনার এক্জিবিশনে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আমার খুবই প্রিয়। আমার যখন টাকা হবে, আমি ছবিটা কিনে আমার ঘরে টাঙাব।'

'ছবিটা বিক্রি হয়ে গেছে। শুধু দেওয়াল বদলানোর অপেক্ষা।'

হৃদিতা আমার দিকে আড়চোখে তাকালেন। তার চোখের দৃষ্টিতে অসহায়তা।

আমি বললাম, 'এই সিরিজের ছবি ভবিষ্যতে আবার আঁকা যাবে। তখন, যদি আঁকতে পারি, যদি পছন্দ হয়, আপনিই নেবেন। আমি রেখে দেব। কাউকে বিক্রি করব না।'

'ঠিক তো? প্রমিজ।'

আমি হেসে মাথা নাড়লাম। আমি কেন এমন প্রতিজ্ঞা করলাম? আমার প্রতিরোধের দেওয়াল কি ভেঙে পড়ছে?

বললাম, 'আচ্ছা, পেইন্টিংসে আপনার আগ্রহটা হলো কী করে বলেন তো?'

'কেন, হতে পারে না?'

'না মানে আমাদের দেশে তো ছবি আঁকাকে ট্র্যাডিশনালি ইন্সপায়ার করা হয় না। আবার ভাবা হয়, আর্টিস্ট মানেই একেবারে গোল্লায় যাওয়া লোকজন। শেভ করবে না, এক কাপড় এক মাস পরবে, গায়ে গন্ধ হবে, মাথায় উকুন।'

হৃদিতা আমার কথা শুনে হাসলেন। বললেন, 'আসলে ছোটবেলা থেকেই আমার ড্রয়িংয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। ছবি আঁকায় ভালো নম্বরও পেয়েছি। কিন্তু ওই যে বললেন, ছবি আঁকাকে ঠিক আমাদের দেশের মানুষ এপ্রিশিয়েট করতে পারে না, তাই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে। আমার আঁকা একটা ছবি দেখবেন।'

'সাথে আছে? নিশ্চয় দেখব।'

'আগে বলেন, হাসবেন না।'

'আরে পাগল, হাসব কেন?'

'খুব যদি পচা হয়।'

'আপনি আমার চেয়ে ছবি ভালোই বোঝেন। আপনি নিশ্চয় এটা বোঝেন যে ছবির পচা ভালো বলতে কিছু নাই। যে যেমন আঁকে, সেটাই তার আঁকা।'

'ঠিক আছে বাবা দেখাচ্ছি। আর সান্ত্বনা দিতে হবে না।' হৃদিতা তার ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট সুভেনির-মতো বের করে বলল, 'গত বছর আমরা ডিপার্টমেন্ট থেকে ট্যুরে গিয়েছিলাম সার্ক কান্ট্রিতে, তার সুভেনির। আসলে এটা হলো এড ছাপিয়ে ফান্ড কালেক্ট করার ফন্দি। তা হোক। প্রচ্ছদটা আমার করা।'

আমি প্রচ্ছদটা দেখছি। হৃদিতা লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে আছে।

বললাম, 'খুব সুন্দর হয়েছে। কম্পিউটার গ্রাফিক্স এত সুন্দর হলো কী করে? এটাও কি আপনার ডিরেকশন?'

'হ্যাঁ' বলে তিনি লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন।

বললাম, 'ড্রয়িংয়ের হাত তো আপনার খুবই ভালো।' সত্যিই ভালো বলে প্রশংসা করতে কার্পণ্য করতে হলো না।

হৃদিতা উঠে আমার আরেকটা ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'আপনার এখনকার ছবিতে নীল ডমিনেন্ট করছে, না?'

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে বলা, আমি জানি।

ছবি দেখা হয়ে গেলে আমরা আবার বসবার ঘরে গেলাম। মা তার জন্যে অনেক খাবার করেছেন। চা বানিয়েছেন। হৃদিতা নিজে পিরিচ তুলে নিয়ে ফিরনি বাড়ল। দুটো পিরিচে। তারপর একটা দিল মা'র হাতে, একটা আমার হাতে।

আমি বললাম, 'আরে করেন কী? আপনি নেন।'

মা হাসিমুখে তার আপ্যায়ন উপভোগ করছেন।

হৃদিতা চলে গেলেন। মা ফুলের ঝুড়িটা আমার ঘরে রাখতে এলেন। বললেন, 'বুড়ো, আমি গলা শুনেই বলেছিলাম না ভীষণ মিষ্টি মেয়ে। কী আমার কথা ঠিক হলো?'

আমি বললাম, 'মিষ্টি কিনা তুমি বুঝলে কী করে? তোমার চায়ের কাপে কি আঙুল ডুবিয়ে দিয়েছিল?'

মা হাসলেন। বললেন, 'বেশ কথা ফুটেছে যাহোক ছেলের মুখে।'

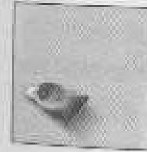
আমার ঘরে হৃদিতার দেওয়া ফুলের ঝাড়। সুগন্ধে সারা ঘর থইথই করতে লাগল।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল হৃদিতাদের সার্ক ট্যুরের স্মরণিকাটায়। এটা নিতে তিনি ভুলে গেছেন। প্রচ্ছদটা তিনি আসলেই ভালো এঁকেছেন। হাতে নিয়ে পত্রিকাটা ওল্টাতে লাগলাম। আরে, ভেতরে তো ট্যুরে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের ছবি আছে। হৃদিতারও আছে কি?

দেখলাম, আছে।

ছবিটা সুন্দর।

ঘরে গোলাপের গন্ধ। বলা উচিত, সৌরভ।



হৃদিতার কথা

রিকশায় করে ফিরছি। শাড়ি পরে রিকশায় ওঠা আমার জন্যে একটু কঠিন। কিন্তু কী করব? আমার তো স্কুটারে ওঠা বারণ। গাড়ি তো আর নেই। অগত্যা রিকশাই আমার পঙ্খীরাজ বাহন। শাড়ি পরলে উল্টো মুখ করে রিকশায় উঠতে হয়। ঠ্যাঙের অনেকটা বের হয়ে পড়ে। নিচ থেকে পেটিকোট উঁকি দেয়। সাবধানে অনেক কষ্ট করে রিকশায় উঠে ফিরছি। মন ভালো। আজ কবির আমার সাথে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করেছেন।

এতোটা ভালো ব্যবহার অবশ্য আমি আশা করিনি। তার ব্যবহার খারাপ, এটা আমি ধরেই নিয়েছি। সবার ব্যবহার এক রকম হবে নাকি?

সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করেছেন তাঁর মা। বাসাটা খুঁজে পাব কিনা, এই ছিল আমার প্রথম উদ্বিগ্নতা। রিকশাওয়ালাকে বলে রেখেছিলাম, শোনেন, বাসা খুঁজতে সমস্যা হতে পারে, অস্থির হওয়া চলবে না। ধীরে ধীরে সময় নিয়ে খুঁজে বের করতে হবে। ঠিক আছে?

রিকশাওয়ালাটা ভালো ছিল। আর বাসা খুঁজে পেতেও তেমন অসুবিধা হয়নি। বাইরের গেট খোলাই ছিল এবং কুকুর হইতে সাবধান ধরনের কোনো সতর্কবাণী ছিল না। ফুলের ঝুড়ি হাতে নিয়ে কম্পিত বক্ষে গেটের ভেতরে ঢুকে গেলাম। আরেকটু হেঁটে গিয়ে ভেতরের গেটের সামনে দাঁড়ালাম। তর্জনী রাখলাম কলিং বেলের সুইচে। গেটটা খুলতে অবশ্য সময় লাগছিল। তেমন গরম নয়, কিন্তু আমি ঘামছিলাম। ভয় হচ্ছিল আমার সাজ না গলে যায়।

আজ কী শাড়ি পরব, কোন ব্লাউজ, এসব নিয়ে আমি কয়েকদিন ধরেই ভেবেছি। মাটির গয়নাগুলো কিনতেও সাধনা করতে হয়েছে। কালকেই চুলে শ্যাম্পু করে রেখেছি। চুল ছাড়া থাকবে না থাকবে না, এই নিয়েও অনেক ভাবতে হয়েছে। বর্ষাকাল হলে নির্ঘাত বেলিফুল চুলে জড়াতাম। সেটা সম্ভব হয়নি।

ফুল কিনেছি লাল গোলাপ। আর ফুলে, আমার ব্যাগ থেকে বের করে নিয়ে গোলাপ-গন্ধী দামি ফরাসি পারফিউমটা প্রায় অর্ধেকটা স্প্রে করে দিয়েছিলাম।

দুবার ডোরবেল বাজিয়েছি। আরেকবার বাজাব কি বাজাব না, যখন ভাবছি, তখনই দরজা খুলে গেল।

দরজা খুললেন একজন প্রৌঢ়া মহিলা। সম্ভ্রান্ত দর্শন। বললাম, 'এটা কি কবিরুল ইসলামের বাসা?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আসুন ভেতরে আসুন।'

'খালাম্মা আমাকে তুমি করে বলেন।'

'তুমি?'

'আমি হৃদিতা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ হৃদিতা, এসো এসো ভেতরে এসো।'

তিনি আমাকে বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। বসতে বললেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'আজকে তো ওনার জন্মদিন, না?

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ বসো বসো ওকে ডেকে দিচ্ছি।'

তিনি ভেতরে অন্তর্হিত হলেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের পেইন্টিংস দেখতে লাগলাম। ঘরটায় একটু পুরোনো ধরনের দামি কাঠের ভারি সোফা। মেঝেতে কার্পেট। মাথার ওপরে ঝাড়বাতি। ফ্যান। ছবি দুটো কবিরুল ইসলামের আঁকা। আর দুটোর একটা কামরুল হাসানের, আরেকটা বিদেশী কোনো শিল্পীর।

খালাম্মা এলেন। বললেন, 'তোমার গলা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম তোমার চেহারা ভীষণ মিষ্টি হবে, দ্যাখো আমার আন্দাজ কেমন ঠিক?'

আমি হেসে বললাম, 'আপনার আন্দাজ ভালো নাকি আপনার অন্তরটা ভালো। সেজন্যে আপনার চোখে সবাইকে মিষ্টি লাগে?'

তিনি জোর গলায় বললেন, 'না না। তুমি দেখতে খুব সুন্দর। তা মা তোমরা কয় ভাইবোন?'

বললাম, 'দুই বোন এক ভাই।'

'তুমি বড়ো?'

'বড়ো বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, সৌদি আরবে থাকে। আমি মেজো। ছোট একটা ভাই আছে।'

'আমার তো একটাই ছেলে। আরেকটা ছিল। মারা গেছে। তিন বছর আগে।'

শুনে খুব দমে গেলাম। 'কেমন করে?'

'এক্সিডেন্টে। ইতালিতে ছিল। ওর বাবাও মারা গেছেন... সেও তো বছর আটেক হলো।'

'ও। আপনি এখানে ছেলেকে নিয়ে থাকেন। আর কেউ নেই?'

'না কে থাকবে? আর্টিস্ট ছেলে তো আমার বিয়েথা করছে না।'

'হ্যাঁ। আর্টিস্টরা একটু অন্যরকম হয় হয়তো।'

'আয় আয় বুড়ো... দ্যাখ আমার আন্দাজ কী রকম তোকে বলেছিলাম না।'

আমার সমস্ত রক্ত চলাচল থামিয়ে দিয়ে কবিরুল ইসলাম এলেন। মনে হয় ঘুম থেকে উঠে এলেন। তাড়াতাড়ি করে বোধ হয় টিশার্ট পরেছেন, সামনের অংশ পেছনে, পেছনের অংশ সামনে এসে গেছে। শিল্পী মানুষ, একটু বেখেয়াল তো হবেনই। বেশ সুন্দর করেই গল্প করলেন। মনে হলো, আমাকে তিনি পছন্দই করেন।

তবে বিদায় নেবার সময় কিন্তু বললেন না, আবার আসবেন। কেন বললেন না? খালাম্মা অবশ্য বার-বার করে বলেছেন, মা, আবার এসো।

আমিও বলেছি, খালাম্মা, আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে আমাদের বাসায় আসবেন। কবির সাহেবকেও বলেছি, আপনি কিন্তু একবার আমাদের বাসায় আসতে চেয়েছেন। সে কথা রাখতে হবে কিন্তু।

কী জানি সে আসবে কিনা।

একটা ভুল মনে হয় গেছে। সার্ক ট্যুরের ম্যাগাজিনটা আনতে ভুলে গেছি। ভালোই হয়েছে। ওটা আনতে আরেকবার যাওয়া যাবে। একটা দারুণ অজুহাত পাওয়া গেল।

এখন আমার বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে, একা একা ঘুরে বেড়াই। কেমন হয়, যদি রমনা পার্কে ঢুকে একা বসে থাকি। কিংবা সংসদ ভবনের

সিঁড়িতে? একা একা হাঁটি, আর উচ্চ শব্দে গান গাই। যে কোনো একটা সিনেমা হলে একা গিয়ে বসি ছবি দেখতে। না হয় ছবি দেখলামই না, শুধুই বসে থাকলাম।

না, তা হবার নয়। এই ঢাকা শহরে একা একজন মেয়ে কিছুই করতে পারবে না।

এমনকি যদি আমি রিকশাওয়ালাকে বলি, চলেন, একা একা এক ঘণ্টা ঘুরব, হাওয়া খাব, তিনি আমার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাবেন। ভাববেন, হয় মাথা খারাপ, নয়তো মেয়ে আমি ভালো না, চেহারা দেখে যে মানুষ বোঝা যায় না, আমি হলাম তার প্রমাণ।

বরং রিকশাওয়ালাকে বলি, ওয়ারি যাবে নাকি? তাহলে অনেকক্ষণ রিকশায় বসে হাওয়া খাওয়া হবে। ওয়ারিতে শাম্মীদের বাড়ি। গেলে ভালোই হবে, গল্প করা যাবে।

শাম্মীদের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। আর রিকশায় বসে থেকে থেকে ব্যথা হয়ে গেল শরীর। তবে রিকশা-সফরটা ভালোই হলো, কারণ একা একা থাকা গেল এবং অনেক কিছু ভাবা গেল। কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা, মনে মনে।

শাম্মীকে বাসায় পাওয়া গেল। সে ছাদে গাছের যত্ন করছে। শাম্মীকে আমরা বলি মহিলা বলাই। সে বোটানির ছাত্রী এবং এক নম্বরের বৃক্ষ- আর প্রকৃতিপ্রেমিক। আপনি যদি কোনো গাছ চিনতে না পারেন, তাহলে তার পরিচয় পাবেন ফলে, কারণ বৃক্ষের পরিচয় ফলে, আর ফলটাই যদি না চেনেন, তাহলে শাম্মীর কাছে আসতে পারেন। সে নির্ঘাত আপনাকে এই গাছের ঠিকুজি বলে দিতে পারবে। একবার একটা গাছের পরিচয়-সংকট দেখা দিলে দ্বিজেন শর্মাকে ডাকা হয়, দ্বিজেন শর্মা এসে নীরব হয়ে যান, পরে শাম্মী দ্বিজেন শর্মাকে চিঠি লিখে গাছটির পরিচিতি সম্পর্কে তার ধারণা জানায়। দ্বিজেন শর্মা সে চিঠির উত্তরে শাম্মীর বৃক্ষজ্ঞান সম্পর্কে একটা প্রশংসাপত্র লিখে পাঠান।

শাম্মীর বৃক্ষজ্ঞান তথা শেকড়জ্ঞান, ফলজ্ঞান, ফুলজ্ঞান বেশ ভালো, এটা মানতেই হবে, তবে কাণ্ডজ্ঞান তেমন ভালো না। একবার সে ঘরে পরার ম্যাক্সি পরে ইউনিভার্সিটিতে চলে এসে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল।

আমি বললাম, 'শাম্মী চল, বলধা গার্ডেন যাই, যাবি?'

'চল।' শাম্মী রাজি।

'যা কাপড়-চোপড় পাল্টে আয়।'

'না পাল্টাতে হবে না। এই তো এখানেই।'

'তোর এ ড্রেস দেখলে গাছরা লজ্জা পেতে পারে। গাছদের মধ্যে কি পুরুষ গাছ নাই?'

'না লজ্জা পাবে না। তবে গাছ বলে তাদের অসম্মান করাটা ঠিক হবে না। ঠিক আছে, একটা ভালো জামা পরে আসছি।'

আমরা বলধা গার্ডেনে গেলাম। দারোয়ান শাম্মীর খুবই পরিচিত। এ বাগানে সে প্রায়ই আসে।

ভেতরে গিয়ে পুকুরের পাড়ে বসলাম।

শাম্মী একটা ফার্ন গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগল।

বললাম, শাম্মী, গাছেদের তো প্রাণ আছে, না?

শাম্মী বলল, আছে।

'হার্ট আছে?'

'মানে কী? ব্লাড সার্কুলেশনের পাম্প?'

'না, হৃদয়?'

'অনুভূতি তো আছে।'

'গাছেরা কি প্রেমে পড়ে?'

'কী জানি?'

'ধর। গাছেদের তো বংশবৃদ্ধি হয়। কেমন করে হয়।'

'আছে ব্যাপার আছে। একেক গাছের একেক ব্যাপার।'

'পুংদণ্ড গর্ভাশয় এসব আছে না। পরাগরেণু যে গর্ভকেশরের কাছে যায়, কেমন করে যায়।'

'বাতাসে ভেসে যায়। প্রজাপতির পাখায় লেগে যায়।'

'ফুল যে রঙিন হয়, সুগন্ধী হয়, এ জন্যেই তো, না? প্রজাপতিকে, মৌমাছিকে কাছে টেনে পরাগরেণু ছড়ানোর জন্যে।'

'হঠাৎ তুই এটা জানতে চাচ্ছিস কেন?'

'ধর আমি একটা নারীগাছ। পুরুষ রেণু কি আমার কাছে আসবে, নাকি আমাকেই যেতে হবে।'

'পাগল।'

'গাছেরা কি প্রেমে পড়ে। প্রেমে পড়ে কষ্ট পায়?'

শাম্মী বলে, 'তা তোর ছেলেটা কে?'

আমি বললাম, 'ছেলে নয় রে। বুড়ো। যে কিয়া করো রাম, মুঝে বুড্ঢা মিল গিয়া।'

'ওরে তলে তলে এত। তা তোর বুড়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দিবি না?'

'না রে।'

'কেন? ছবি আছে, দেখাবি?'

'উঁহু।'

'কেন?'

'আমি ঠিক করেছি আমি গাছ হব। কোনো ছবিটবি থাকবে না। কোনো পরিচয়-টরিচয় করিয়ে দেবার ব্যাপার থাকবে না।'

'গাছ না। তুই পাগলি হবি। তোর লক্ষণ খুব খারাপ। কয়েকদিন পরে কাপড়চোপড় না পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবি।'

আমি বললাম,'ক্ষতি কী? গাছেরা কি কাপড় পরে?'

'বুঝেছি। তোকে গাছ দিয়েই ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। চোত্তা গাছের পাতা তোর গায়ে ঘষে দিতে হবে।'

কী আশ্চর্য দেখুন। শাম্মী কথা বলছে একেবারে হিসেব করে করে, আর আমার অবস্থা হয়ে পড়েছে আলুথালু। শাম্মী আমার বেদনাটা বুঝছে না।

বুঝবে কী করে? ও যেদিন প্রেমে পড়বে সেদিন বুঝবে।

সেদিন আবার আমি ওকে নিয়ে হাসাহাসি করব।

ভালোবাসা একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মতো, যার ওপর দিয়ে যখন যায়, কেবল সেই বোঝে, কেবল তখনই বোঝে, অন্যেরা বোঝেও না, সেই একই লোক অন্য সময়, দশা কেটে গেলে, বুঝতে ব্যর্থ হয়।

আমি গুনগুন করে গান ধরলাম :

প্রথমত আমি তোমাকে চাই
দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই
তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই
শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে চাই।

শাম্মী বলল, 'তোর গানটা আমি ভাবলাম, সমান্তর সিরিজ এবং শেষটা হবে ইনফিনিটি। ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি ডট ডট ডট ইনফিনিটি। কিন্তু তোর চাওয়ার তো শেষ আছে দেখতে পাচ্ছি। আমি হলে গাইতাম,

প্রথমত আমি তোমাকে চাই
দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই
তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই
অসীম পর্যন্ত আমি তোমাকে চাই।

হেয়ার এল ইজ ইনফিনিটি।'

আমি বললাম, 'ঠিক বলেছিস, মহিলা বলাই। বোটানি পড়লেও তো তুই এলজেব্রা ভুলিস নি রে। এন্ডলেস চাওয়া। যত পাই, তত চাই। না পেলে আরো চাই। মাই লাভ নোস নো বাউন্ড।'

এক সপ্তাহ আমি কবির সাহেবদের বাসায় ফোন করিনি, যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। এর মধ্যে একটু ব্যস্ত হয়ে গেলাম ক্লাসের একটা এসাইনমেন্ট জমা দেওয়া নিয়ে। রফিক স্যারের কাজ। ফাঁকি দেবার উপায় নেই। কাজেই নাসরিন আর আমি পড়ে রইলাম লাইব্রেরিতে। স্টাডি করা, নোট নেওয়া, তারপর পুরো জিনিসটা লিখে ফেলা আর সবশেষে নীলক্ষেতে কম্পিউটারের দোকানে গিয়ে লেখাটাকে কম্পোজ করিয়ে

প্রুফ দেখে ফাইনাল প্রিন্ট নেওয়া। ক্লিপ ফাইল কিনে পাঞ্চিং মেশিনে কাগজ ফুটো করে সুন্দর পরিপাটি করে রিপোর্টটা জমা দিয়ে মনে হলো, আহ বাঁচা গেল। এর মধ্যে যে কবির সাহেবের কথা মনে পড়ে নি, তা নয়। সারক্ষণই পড়েছে। আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকলখানে অবস্থা। লিখতে বসে আধঘণ্টা পার হয়ে গেছে, হঠাৎ দেখি খাতায় কিছু হিজিবিজি ছাড়া আসল লেখার কিছুই হয়নি। কেবল তার কথাই ভেবেছি এতক্ষণ। মনে মনে তার সাথে কথা বলেছি, কথার পিঠে কথা সাজিয়েছি। বাইরের লোক আমার এই বিড়বিড় করা দেখলে নিশ্চয় ভাববে যে আমি জিনে-ধরা মেয়ে।

আজ আর কোনো কাজ নেই। আজ আবার জগত ফাঁকা ফাঁকা লাগতে শুরু করেছে। বার বার ফোনটা আমাকে টানছে। তা ফোন করে ফেললেই হয়।

ফোনের কাছে গেলাম। ফোন নম্বর মুখস্থ আছে। রিসিভার কানে ধরলাম। ডায়াল টোন নেই। মেজাজটা কার ঠিক থাকে বলেন। ফোন রেখে পায়চারি করতে লাগলাম। কী করা যায়? আবার গেলাম ফোনের কাছে। হ্যাঁ, এবার ফোন ঠিক আছে।

'হ্যালো।' খালাম্মার গলা।

'হ্যালো খালাম্মা স্লামালেকুম! কেমন আছেন?'

'কে হৃদিতা। আছি মা ভালো আছি! তুমি ফোন করেছো, ভালো করেছো। কয়েকদিন থেকে আমি তোমাকে খুঁজছি। ফোন নম্বর থাকলে আমিই তোমাকে ফোন করতাম।'

'আমার ফোন নম্বরটা আমি এখনই আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। আপনি রেখে দিন।'

'বলো। দাঁড়াও, এক মিনিট, আমি কাগজ-কলম নিয়ে আসি...বলো'

আমি তাঁকে নম্বর দিয়ে দিলাম। তারপর বললাম, 'এখন বলেন, কেন আমাকে খোঁজ করছিলেন?'

'একটা খবর আছে! তুমি তো কয়দিন আসো না। ফোনও করো না। এদিকে আমার আর্টিস্ট ছেলে কী করেছে জানো!

'কী করেছে খালাম্মা!'

'আহা বেচারা। একলা ঘরে বসে তোমার ছবি আঁকছে!'

'আমার ছবি?'

'হ্যাঁ। তোমার ছবি!'

'কীভাবে আঁকলেন। আমি তো তার সামনে ছবির জন্যে সিটিং দেইনি!'

'সিটিং দিতে হবে কেন? একবার যাকে দেখে যদি তাকে ভালো লেগে যায়, মনের মধ্যে গেঁথে রাখে। মন থেকে আঁকে!'

'তাই নাকি! খালাম্মা, আপনি ভুল দেখেননি তো!'

'নাহ! ভুল দেখব কেন! অতো সন্দেহ হলে তুমিই চলে এসো। নিজ চোখে দেখে যাও।'

'উনি কখন বাসায় থাকেন?'

'সারাক্ষণই প্রায় থাকে। আজও সারাক্ষণ থাকবে! এখন তো মন দিয়ে ছবি আঁকছে। এখন আর ডাকি না। কাল তুমি চলে এসো কেমন?'

'আসব?'

'হ্যাঁ। আমি বলছি! আমি না তোমার খালাম্মা হই। চলে এসো। আসছ তো?'

'আচ্ছা! আপনি যখন বলছেন!'

ফোন রেখে দিলাম। মনে হচ্ছে এখনই চলে যাই। কিন্তু এখন সন্ধ্যা। যাওয়াটা ঠিক হবে না। আর তাছাড়া খালাম্মা বলেছেন কাল যেতে। এখন এই রাতটা কাটাব কী করে? এক কাজ করি। এলিফ্যান্ট রোডে যাই। একটা ক্যাসেটে *প্রথমত আমি তোমাকে চাই* গানটা বারবার রেকর্ড করাতে দেই। পুরো ক্যাসেটজোড়া এই এক গান থাকবে। কালকে যাবার সময় এটা নিয়ে যাওয়া যাবে। ওঁর ছবি আঁকার ঘরে তো ক্যাসেট প্লেয়ার আছে। গাড়িতেও তো উনি গান শোনেন।

কেমন হবে, তাকে বলব, এই গানগুলো শুনবেন। কেমন লাগল, পরে আমাকে জানাবেন।

তিনি হয়তো কোনো এক অবসর মুহূর্তে ক্যাসেট ছেড়ে দেবেন।

গান বাজবে। প্রথমত আমি তোমাকে চাই। দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই। গান শেষ হবে। আবার একই গান। আরে কী ব্যাপার? তিনি ক্যাসেট উল্টে দেবেন। এ পিঠেও আমি তোমাকে চাই। তিনি ফরোয়ার্ড করে দেবেন। ফরোয়ার্ডেও আমি তোমাকে চাই।

আমাকে বলবেন, কী ব্যাপার, বার বার একই গান কেন? (যেন কিচ্ছু বোঝে না। নেকু)। আমি বলব, এ হলো ফুয়াদের গল্প বলা। চড়ুই পাখি সারাক্ষণ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে। কাজেই তারপর ফুড়ুৎ, তারপরও ফুড়ুৎ। ফুড়ুৎ আর শেষ হয় না।

বুঝলাম না।

বুঝবেন। যেদিন আমি থাকব না, সেদিন বুঝবেন।

যে কথা সেই কাজ। আমি চললাম *গানের ডালি* অভিমুখে। বললাম, একটা সনি ক্যাসেটে প্রথমত আমি তোমাকে চাই গানটা বারবার রেকর্ড করে দেন। জরুরি। একঘণ্টা পরে এসে নিয়ে যাব।

ওরা বলল, সাথে কি তোমাকে চাই-এর সেকেন্ড পার্টটাও দেব?

সেটা আবার কোনটা?

এই আপারে অমরত্বের *প্রত্যাশা নেই* গানটা শোনাও।

কর্মচারী একজন একটা ক্যাসেট খুঁজে পেতে একটা গান ছেড়ে দিল :

অমরত্বের প্রত্যাশা নেই নেই কোনো দাবি-দাওয়া
এই নশ্বর জীবনের মানে শুধু তোমাকে চাওয়া

......
বার বার আসি আমরা দুজন বারবার ফিরে যাই
আবার আসব আবার বলব শুধু তোমাকেই চাই

আমি বললাম, 'না, এটা দিতে হবে না। বরং এটা যে অ্যালবামে আছে, ওই ক্যাসেটটাও দিয়ে দেন। কালেকশনে থাকুক।'

আজ সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে আমার প্রস্তুতি। চুলে শ্যাম্পু করা, নখ কাটা, নেইল পালিশ লাগানো, আগে সময় পেলে হাতে মেহেদির আল্পনাও করতাম, এসব চলছে। জামা ইস্ত্রি করতে হলো। কোন জামাটা পরব, ঠিক করতে পারছি না। ফলে দুটো সেট ইস্ত্রি করে রাখলাম। কাপড়চোপড় পরে একটু ঠোঁটে লিপস্টিক লাগানো, গালে একটু রুজ বোলানোকে কি আপনি সাজ বলবেন।

ঘরে মন্টি উঁকি দিলো। বললো, 'আপা, তুমি কি কোথাও যাচ্ছো!'

'হ্যাঁ।'

'বিশেষ কোথাও!'

'কেন?'

'একটু বেশি সাজগোজ হয়ে যাচ্ছে না?'

'বেশি হয়ে যাচ্ছে নাকি! পাকামো করার দরকার নাই। অয়েল ইয়োর ওন মেশিন। নিজের চরকায় তেল দে।'

'কী তেল দেবো বলো! সরষে না সয়াবিন?'

'পাকামো করতে হবে না, যা!'

'আপা, তুমি কি আজো বেবিট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছো নাকি?'

'না! উঠতে যাচ্ছি না।'

'গুড! না ওঠাই ভালো! আর উঠলে দয়া করে বলে দাও, কখন কোথায় তুমি ফিট হচ্ছো, আর কোন হাসপাতালে ভর্তি হতে যাচ্ছো!'

'মন্টি! আমি একটা বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছি। ব্যাপারটা সিরিয়াস। এখন তুই তোর কাজ কর। গাড়ির গ্লাস চুরি রহস্যের তো সমাধান করতে পারলি না!'

'সমাধান! সমাধান করতে গিয়ে তো মাথায় পড়ল ময়লার ব্যাগ। মাথায় কতো কতো শ্যাম্পু মেখেছি জানো। ছিঃ ছিঃ! ঘেন্না। সেই মিস্ত্রিটার কুলকিনারা হলো না! তবে আমি অনেক দূর এগিয়েছি। সেদিন যে বাদামওয়ালা এসেছিল, দারোয়ান চাচাকে বলে দিয়েছি, সে এলেই যেন তাকে ধরে। তার কাছ থেকে জানা যাবে কোন স্কোরে সে সেদিন বাদাম বেচেছিল।'

'আমাকে কেমন লাগছে রে!'

'ভালোই।'

'ভালোই মানে কী করে? ভালো করে বল!'

'বেশ ভালো! আপা একটা কাজ করি! তোমাকে ছাতা দিয়ে এগিয়ে দিই! বলা তো যায় না, ওই খবিসগুলো আবার যদি মাথায় ময়লা ফেলে!'

'অ্যাঁ, ছিঃ ছিঃ! তাহলে তো আমি নির্ঘাত মরে যাবো! মাছের পচা ময়লা। ভালো বলেছিস। চল! ছাতা দিয়ে একটা রিকশা পর্যন্ত এগিয়ে দে।'

'চলো!'

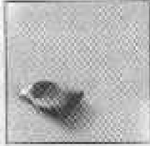
মন্টি আমাকে রিকশা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। রিকশা পাওয়া যাচ্ছিল না বলে খানিকটা পথ হাঁটতে হলো। রিকশায় উঠে ওকে দশটা টাকা দিয়ে বললাম, পেপসি খাস। তবে অন্য কোথাও না, সোজা বাসায় যা।

রিকশা চলতে শুরু করল। আমার হৃদপিণ্ডও দুলতে লাগল সশব্দে।

আমি কি তার দেখা পাব?

দেখা পেলে তিনি আমাকে দেখে খুশি হবেন কি?

ক্যাসেটটা সুন্দর করে প্যাক করে নিয়েছি। এটা উনি বাজিয়ে শুনবেন কি?



কবিরের কথা

মেয়েটা কোত্থেকে উড়ে এসে আমার হৃদয় জুড়ে বসল? আমার এ-রকম হচ্ছে কেন? এমন তো নয়, জীবনে প্রথম আমি মেয়ে দেখছি! আর্ট ইন্সটিটিউটে পড়ার সময় অনেক মেয়েই তো আমার সহপাঠী ছিল। জুনিয়র মেয়েও তো কম ছিল না। তাদের সঙ্গে একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, হুটোপুটিও তো কম হয় নি? তাহলে?

বহুদিন পোর্ট্রেট করি না। একটা কাজ করলে কেমন হয়, আমি তার একটা পোর্ট্রেট করি।

ওর ফটো তো আছেই এই ঘরে। সেটা দেখে একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। হয়তো ভালো হবে না। হয়তো চেহারা মিলবে না। আমি তো আর শিশির ভট্টাচার্য্য না যে হেসেখেলে মানুষের চেহারা নিয়ে খোলামকুচি খেলতে পারব? তেলরঙে আঁকাটাই ভালো হবে। যদি কোনো কারণে ছবিটা ভালো হয়ে যায়, হয়তো অনেক দিন টিকবে। খারাপ হলে না হয় আমিই নষ্ট করে ফেলব।

হায় টিকে থাকার বাসনা! হায় বেঁচে থাকার আকুলতা!

এক সময় দেখা গেল আমি সত্যি সত্যি হৃদিতার মুখ নিয়ে আমার স্কেচ খাতায় স্টাডি করতে শুরু করেছি। এইভাবে একদিন, দুদিন, তিনদিন কেটে গেল। তারপর শুরু করলাম ইজেল বসানো, স্ট্রেচারে ক্যানভাস জোড়া, তুলি ধরা, রঙ চড়ানো। ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে তার মুখ।

আমার ধারণা ছিল, মাকে আমি বুঝতে দেইনি আমার এই দুর্বলতা। কী আঁকছি মা যেন বুঝতে না পারেন, সে জন্যে দরজার উল্টো দিকে মুখ করে রেখেছি ক্যানভাস, ইজেল। মা তো দরজা পর্যন্তই উঁকি দেন, ভেতরে আসেন না। কিন্তু মা'র কাছে আমি ধরা পড়ে গেছি। শুধু মা'র কাছে নয়, যার ঘরে সিঁদ কেটেছি, তার কাছেও। সেটা পরের ঘটনা। তার আগে যা ঘটল, ডোরবেল বেজে উঠলে আমি দরজা খুললাম। দেখতে পেলাম হৃদিতা দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। তাকে দেখা যাচ্ছে অপূর্ব। সরষে রঙের একটা জামা পরেছেন, তাতে তার ঔজ্জ্বল্য একেবারে ঝকমক করছে। তার দিকে তাকানো যাচ্ছে না, এতই সৌন্দর্যের ছটা, তার দিক থেকে মুখ ফেরানো যাচ্ছে না, এমনি আজ তার আকর্ষক ক্ষমতা।

সত্যি বলতে কী, তাকে দেখে খুশিই হয়েছিলাম। হেসে বললাম, 'হৃদিতা, আপনি!'

বললেন, 'হ্যাঁ। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। চলে এলাম!'

'আসেন। ভেতরে এসে বসেন।'

বসবার ঘরে বসা গেল। তারপর এ রকম একটা অবস্থা দাঁড়াল যে, আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাই, কিন্তু কথা খুঁজে পাই না।

শেষে তিনিই নীরবতা ভাঙেন, 'আপনার ছবি আঁকা কেমন হচ্ছে!'

বললাম, 'নাহ্, আঁকতে পারছি না।'

'নতুন কিছুই আঁকেননি!'

'না। তেমন কিছু না!'

'নাহ্ এঁকেছেন। আমি জানি আপনি এঁকেছেন।'

'জানেন! কী করে জানলেন!'

'অন্তরের চোখ দিয়ে। দেখতে পেলাম আপনি আঁকছেন! কাকে আঁকছেন, তাও আমি দেখতে পেলাম! শুধু বুঝতে পারলাম না কেন আঁকছেন।'

তখন মনে হলো আমি যে ভেবেছিলাম, মা আমার কাণ্ডকীর্তি দেখেন নি, এটা সত্য নয়। গুপ্তচর তো আমার ঘরের ভেতরেই রয়ে গেছে। বললাম, 'মা কি আপনাকে কিছু বলেছে!'

হৃদিতা নীরব রইলেন।

নীরবতা সম্মতির লক্ষণ। তার মানে মা বলেছেন। ধরা পড়ে গিয়ে হঠাৎ করেই ভারি রাগ হলো। চিৎকার করে মাকে ডাকতে লাগলাম, 'মা, মা!

হৃদিতা বললেন, 'না না! খালাম্মাকে ডাকছেন কেন?'

মা এলেন। তার চোখে-মুখে ভয়।

বললাম, 'মা তুমি কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করছো, অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে! যাও।'

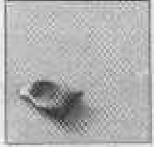
মা চোখের সামনে থেকে আড়াল হলেন। রাগী গলায় একটু উঁচু স্বরে বললাম, 'শোনেন হৃদিতা, আপনি আর আমাদের বাসায় আসবেন না! আপনি আর কখনও আমাদের বাসায় ফোন করবেন না। বুঝলেন!'

তিনি বললেন, 'স্যরি।'

আমি রাগ ধরে রেখে বললাম, 'সরিটরি না। আপনি এখন ওঠেন। চলে যান।'

তিনি বললেন, 'আমি সত্যি দুঃখিত। আপনাদের মা-ছেলের মধ্যে আমার এসে পড়াটা উচিত হয় নি।... ঠিক আছে... আমি যাচ্ছি।'

তিনি উঠলেন। তার চোখে জল। মনে হলো, এ মেয়ে জীবনে কোনোদিনও অপমানিত হয়নি, অপমান কাকে বলে সে জানত না। এখন এই অপ্রত্যাশিত আঘাত সে সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। তার চলে যাওয়াই ভালো। এ কাজটা কঠিন, কিন্তু ভীষণ জরুরি। আমি আজ অত্যন্ত জরুরি কঠিন কাজটি করে ফেলতে পেরেছি। আরো খানিকক্ষণ আমাকে এই কাঠিন্য রক্ষা করতে হবে।



হৃদিতার কথা

রিকশা চলছে। আমি ফিরে আসছি। চারদিকে রোদ ঝাঁঝা করছে। এই রৌদ্রালোকিত সকালের কাছে আজ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে আমার অপমান। এ মুখ আমি লুকোবো কোথায়। দু'চোখ ভেঙে জল নামছে। হুডতোলা রিকশা কি আর আমার কান্না গোপন করতে পারবে?

আমার কী দোষ? আপনি আমার ছবি আঁকতে পারবেন, আর আমি সে-সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারব না?

রাগে-দুঃখে-অপমানে মনে হচ্ছে, আমার হাতে যদি একটা ইরেজার থাকত, আর চারদিকের দৃশ্যগুলো যদি আমি মুছে দিতে পারতাম, তাহলে সবকিছু এখনই আমি মুছে দিতাম, ঘষে ঘষে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতাম আমাকে ঘিরে থাকা এ পরিপার্শ্ব।

কী ভেবেছেন তিনি নিজেকে? কেন তার এতো অহঙ্কার? কেন তিনি কাউকে মানুষ বলে জ্ঞান করবেন না?

ঠিক আছে দেখা যাবে, একদিন আমার কাছেই আসতে হবে তাকে! দু'হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে হবে। কীভাবে তা হবে, আমি জানি না, কিন্তু আমি জানি, ভালোবাসার নিশ্চয় একটা শক্তি আছে, আন্তরিকভাবে ভালোবাসলে কি পাথর পর্যন্ত সাড়া দিতে বাধ্য নয়?

এখন আমি কোথায় যাব? এই সাজ-পোশাক নিয়ে? যেন সবাই বুঝে ফেলছে আমি কোথায় গিয়েছিলাম। আমার প্রথম কর্তব্য হবে বাসায় ফিরে গিয়ে এ সাজপোশাক খুলে ফেলা। তারপর অন্য কিছু।

বাসার কাছে গলির মুখে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ হচ্ছে। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা দেখছে মন্টি। কী রকম মেজাজ খারাপ হয়, বলুন।

আমি রিকশাওয়ালাকে বললাম, 'এই রিকশা দাঁড়ান তো।' তারপর হাঁক ছাড়লাম, 'মন্টি, এই মন্টি, এদিকে আয়।' মন্টির মাথায় ছাতা। তার মানে সে এতক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ দেখছে। এতক্ষণে চোখের মাথা পুরোটাই খাওয়া শেষ।

মন্টি কাছে এল। আর আমি সোজা ওর গালে এক চড় বসিয়ে দিলাম। 'ওঠ গাধার বাচ্চা, রিকশায় ওঠ।'

মন্টি কাঁদতে কাঁদতে রিকশায় উঠল।

বাসায় ঢুকে কানে ধরে মন্টিকে নিয়ে গেলাম মা'র কাছে। 'মা, দেখো, তোমার বুদ্ধিমান ছেলের কাণ্ড। এক ঘন্টা ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওয়েল্ডিং দেখছে।'

মা বললেন, 'তাতে কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে মানে? মা আর ছেলের তো দেখছি মগজের পরিমাণ সেম। আরে তুমি টু স্ট্রোক ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন বোঝো, এটা জানো না। এক ঘন্টা ওয়েল্ডিং দেখলে মানুষের চার চোখ কানা হয়ে যায়। ওরটা তো হয়েছে হয়েছে, তোমারগুলোও কানা হয়ে যাবে। তারপর মা আর ছেলেকে রাস্তার ধারে বসিয়ে দিয়ে আসব, ভিক্ষা করবে।'

মা আর্তনাদ করে ওঠেন, 'এখন তাহলে উপায়?'

'যাও। ওর চোখ ঠাণ্ডা পানিতে ভালো করে ধুয়ে দাও, যাও।'

মা তাড়াতাড়ি করে ফ্রিজ থেকে পানি বের করেন।

'বেশি ঠাণ্ডা লাগবে না। অল্প ঠাণ্ডা হলেই হবে। বেশি করে ধুয়ে দাও।' চিৎকার করে বলে নিজের ঘরে গেলাম। দরজা বন্ধ করে দিয়ে পরনের কাপড়চোপড় ছুড়ে মারলাম এদিকওদিক। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার ছেড়ে দিলাম জোরে।

তারপর কাঁদতে লাগলাম হাউমাউ করে।

এত কান্নাও জমা ছিল আমার শরীরে।

চোখের জল ঝরনার পানিতে মিশে মিশে চলে যেতে লাগল নর্দমায়।

মনে হয় সমস্ত জগত আজ আমার চোখের জলের কারণে নোনা হয়ে যাবে।

রাত্রিবেলা ঘুম আসছিল না কিছুতেই। শুধু এপাশ-ওপাশ। আর রাজ্যের চিন্তাভাবনা। কী করা যায়? কী বলা যায়? তারপর বিছানা ছেড়ে উঠলাম। ডাইনিং স্পেসে গিয়ে

জগ থেকে পানি ঢাললাম গ্লাসে। কান্নার শব্দ আসছে। মন্টি মনে হয় কাঁদছে। গেলাম ওর বিছানার কাছে।

'কীরে মন্টি, কাঁদিস কেন?'

'চোখে ব্যথা।' আলো জ্বালালাম।

'দেখি। চোখ খোল।'

'খুলতে পারছি না। জ্বালা করছে।'

'যা ওয়েন্ডিং দেখতে যা।'

মা এলেন। বললেন, 'কী হয়েছে রে তোরা ঘুমাস না কেন?'

'ঘুমাব কী করে? তোমার ছেলে চোখের কী অবস্থা। দেখো।' বললাম।

'সর্বনাশ এখন কী করি?' মা আঁতকে উঠলেন।

বললাম, 'এক নম্বর কথা মাথা ঠাণ্ডা রাখো। চিল্লাচিল্লি করতে পারবে না। আব্বাকে জাগানো যাবে না। আব্বা যদি টের পায়, তাহলে সারারাত পায়চারি করবে। আর ঘুমাবে না।'

'তাহলে করবটা কী?' মা বললেন।

বললাম, 'এত রাতে আর কী করবে, মনিভাইজানকে ফোন করো। উনি কী বলেন শোনো।'

'ঠিক', মা বললেন, 'কিন্তু মনি যদি ওষুধ দেয়?'

'লাজ ফার্মা থেকে কিনে আনব। আগে কী বলে শোনো।'

'মানে তোর আব্বাকে ডাকতেই হচ্ছে।'

'মা। চলো তো আগে ফোন করি।'

আব্বাকে ডাকতে হলো না। নিজেই উঠে এলেন। আব্বা তার ছেলেমেয়ের জন্যে এত অস্থির হন যে এটা ঠিক স্বাভাবিকতার মধ্যে পড়ে না বলে আমার মনে হয়। এখন তিনি সারারাত মন্টির পাশে বসে থাকবেন, কোনো সন্দেহ নেই।

মা মনিভাইজানকে ফোন করলেন। তিনি আমাদের একজন খালাতো ভাই, এমবিবিএস, ইন্টার্নি করছেন। মনিভাইজান একটা ওষুধ বলে দিলেন। আমাকে ফোন ধরে সেই ওষুধের নাম লিখে নিতে হলো। একটা ওয়েন্টমেন্ট। ব্যথার জন্যে প্যারাসিটামল। (বাসায় আছে। কিনতে হবে না।) সঙ্গে দিলেন ঘুমের ওষুধ। আব্বা চললেন লাজ ফার্মায়, ওষুধ কিনতে। ওষুধ এল।

মন্টির চোখে মলম লাগিয়ে দিলাম। ওকে ঘুমের ওষুধ আর প্যারাসিটামলও খাওয়ানো হলো। আমি ওর পাশে বসে ওর চুলে বিলি কেটে দিতে লাগলাম। আধঘণ্টা পর ও ঘুমিয়ে পড়ল।

আব্বা এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন এ ঘরে। বললাম, আব্বা, যান ঘরে যান। ঘুমান।

আব্বা চলে গেলে আমি ঘুমের ওষুধ একটা খেয়ে নিলাম।

তবু বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে হলো অনেকক্ষণ।

ঘুম ভাঙল সকালবেলা আম্মার ডাকে। তিনি ফিসফিসিয়ে বলতে লাগলেন, এই কবির নামে একজন এসেছেন। তোকে খুঁজছে।

'বলো কী?' আমি উঠে কী করব আর বুঝছি না। তারপর আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়ে বললাম, 'মা তাকে বসতে দাও। আমি চোখে-মুখে পানি দিয়ে আসছি।'

মা বললেন, 'ড্রয়িং রুমে তো মন্টি শুয়ে আছে।'

আমি বললাম, 'ওকে তোলো। এ ঘরে নিয়ে এসো। ফতে, এই ফতে, ড্রয়িং রুমের বিছানা এক মিনিটে ঠিক কর। দৌড়।'

বাথরুমে গিয়ে চোখে পানি দিয়ে পরনের রাত্রিপোশাক বদলে ফেললাম দ্রুত। ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ালের দিকে মুখ করে। দেওয়ালে একটা গাজির পট বাঁধানো ছিল, তিনি মন দিয়ে সেটা দেখছেন। আমি গিয়ে সোফার এক কোনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মনে মনে বললাম, আমি জানতাম তুমি আসবে এবং একবার এসে যখন পড়েছ, তোমার আর মুক্তি নাই। মানকা চিপা কাকে বলে তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

বললাম, 'স্লামালেকুম। বসেন।'

তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ।' (আবার ধন্যবাদ কয়রে। কালকা কেমন ব্যবহার করছিলা, মনে নাই। এখন যদি তোমারে বার করে দেই।) তারপর বললেন, 'আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

'বসেন', আমি আবার বললাম।

তিনি বসলেন। তাকে সহজ করার জন্যে আমি বললাম, 'ওই ছবিটা গাজির পট। আমাদের এক ক্লাসমেটের মা গ্রাম থেকে আনিয়ে দিয়েছেন। একজন মাত্র শিল্পী নাকি এখন এই কাজ করছেন। তিনি মারা গেলে এ শিল্প মরে যাবে।'

তিনি পটটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন।

বললেন, 'আপনার সঙ্গে কাল খুব খারাপ ব্যবহার করেছি। আমি খুবই অনুতপ্ত।'

আমি কিছু বলছি না। চুপ করে আছি। আসলে এইখানে বাসার ভেতরে কি এসব আলাপ হয়। শেষে বললাম, 'আপনি বসেন। আমি একটু চা বানিয়ে আনি। চা-টা কিন্তু আমি খারাপ বানাই না।'

তিনি বললেন, 'চা। না, এখন আর চা খেতে চাই না। আপনি বরং একটু কি এখন আমার সঙ্গে বেরুতে পারেন। এই তো সামনে কুপার'স পর্যন্ত গেলেই চলবে। একটা বিষয় আপনাকে একটু জানানো দরকার।'

'ঠিক আছে যাচ্ছি। এক কাপ চা খান অন্তত। আচ্ছা ঠিক আছে, চা-ও খেতে হবে না। মা'র সাথে একটু যদি পরিচিত হতেন।'

মাকে ডেকে আনলাম। 'মা, ইনি হলেন বিখ্যাত শিল্পী কবিরুল ইসলাম। উনিই সেদিন আমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আর ইনি হলেন আমার মা।'

তিনি মাকে সালাম দিলেন।

আমি তাকে এক গ্লাস কোমল পানীয় দিয়ে বললাম, 'আপনি এক মিনিট বসেন। আমি তৈরি হয়ে আসছি।'

নিচে তার গাড়ি দাঁড় করানো। এই গাড়িটা আমি চিনি। এই গাড়িতেই তিনি আমাকে হাসপাতালে নিয়েছিলেন (ধারণা করা যায়) এবং হাসপাতাল থেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন (নিশ্চিতভাবে বলা যায়)।

আজ অবশ্য গাড়ির কাচ হারানোর ভয় নেই। আজ ড্রাইভার আছে।

গাড়িতে উঠতে হবে। এখন একটা প্রশ্ন দেখা দেবে। আমি কোথায় বসব। উনি কি আমাকে পেছনে দিয়ে নিজে সামনে ড্রাইভারের কাছে বসবেন। দেখা যাক, উনি কী করেন। উনি আমাকে পেছনের একটা দরজা খুলে ধরলেন। আমি থ্যাংক ইউ বলে পেছনে উঠে পড়লাম। এবার দেখি, তিনি কোথায় ওঠেন। গাড়ির পেছন দিক দিয়ে ঘুরে তিনি উল্টো দিকে গেলেন, ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে, তিনি পেছনেই বসলেন এবং পেছনের সিটেই।

তিনি আমার ডানে বসে আছেন। আমি তার বামে। এত কাছ থেকে তার দিকে তাকানোও যাচ্ছে না। আমরা দুজন পাশাপাশি বসে আছি, এর চেয়ে ভালো ঘটনা পৃথিবীতে আর কী ঘটতে পারে?

কাছেই একটা খাবারের দোকানে আমরা বসলাম। সকালবেলা। ভিড় কম। মুখোমুখি দুজন বসা। সামনে গোল টেবিল। তাতে তার হাত রাখা। হাতে কী সুন্দর রোম। আর ঘড়িটা দেখো। সাদা ডায়াল, কালো কাঁটা। টিকটিক করছে। আমার বুকের মতো। টেবিলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানা বার্তা লেখা। আই লাভ ইউ। হৃদয়ের চিহ্ন। টেলিফোন নম্বর। সামু। সামুটা ছেলে না মেয়ে বোঝা যাচ্ছে না। বাংলায় চ দিয়ে বাজে কথা। ইংরেজিতে এফ দিয়ে।

'কী খাবেন?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বললাম, 'আপনি আমার গেস্ট। আপনি বলেন কী খাবেন।'

'কফি।' তিনি বললেন।

আমি উঠে গিয়ে দুটো কফি আর দুটো সমুচা দিতে বললাম। তারপর তার সামনের চেয়ারে বসে পড়ে বললাম, 'বলেন।'

তিনি বলতে লাগলেন, 'আপনার সঙ্গে অমন একটা বাজে ব্যবহার করার পর আমি সত্যি ভীষণ অনুতপ্ত। আর মা তো রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন। বিছানা নিয়েছেন। উঠছেন না। কথা বলছেন না। খাওয়া-দাওয়াও করছেন না। এখন একমাত্র উপায় হলেন আপনি। আপনি যদি আমাদের বাসায় যান, মাকে বলেন যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছি আর আপনি ক্ষমা করেও দিয়েছেন, তাহলে হয়তো আমার ওপর থেকে মা'র রাগ পড়তে পারে।'

আমি বললাম, 'ও, তাহলে ব্যাপার এই, আপনার মা'র রাগ ভাঙানোর জন্যে আমার প্রয়োজন।'

তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। 'ছিঃ ছিঃ, আমি এভাবে বলতে চাইনি। না না মাকে আপনার কিছু বলতে হবে না। আমি সত্যি সত্যি ভীষণ সরি। অনেস্টলি ক্ষমা চাচ্ছি। প্লিজ প্লিজ ফরগিভ মি। আর তা ছাড়া আপনি যদি আমার সব কথা জানতেন, আমার ওপরে মোটেও রাগ করতে পারতেন না।'

বললাম, 'কী কথা?'

তিনি বললেন, 'হৃদিতা, আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আপনার চেয়ে জীবনটা আমি অনেক বেশি বুঝি। আপনার বয়স কম। অভিজ্ঞতা কম। আবেগ বেশি। আপনি চলবেন ইমোশনালি, খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনটা শুধু ইমোশন দিয়ে চলে না। আপনার কাছে হাতজোড় আমি অনুরোধ করছি, আপনি আমার জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়াবেন না।'

আমি বললাম, 'কেন, জানতে পারি?'

'না।'

বললাম, 'আমি কি আপনাকে দুটো প্রশ্ন করতে পারি?'

'পারেন। তবে উত্তর না দেবার অধিকার আমার থাকতে হবে।'

'ঠিক আছে! আপনি কি বিবাহিত?'

'না।' বিষণ্ন হাসি তার মুখে।

'আপনার কি বাচ্চাকাচ্চা আছে?'

'না।'

'কোনো মেয়ের সঙ্গে আপনি ইনভলভড। কথা দিয়ে ফেলেছেন?'

'তেমন কিছু না।'

'তাহলে?'

'সেকথা যে আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি না। শুধু চাচ্ছি আপনি আর আমার সঙ্গে ইনভলভড হবেন না, অনুরোধ করে বলছি, মিনতি করে।'

'ঠিক আছে।' আমি কঠিন স্বরে বললাম। নিজেকে বোঝাতে লাগলাম, আমি কি এতই ফেলনা?

রেগেমেগে বললাম, 'ঠিক আছে, আমি আর আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব না, রাখবার কোনো চেষ্টাই করব না, আসি।' আমি উঠে পড়লাম। কাউন্টারে গিয়ে ব্যাগ থেকে টাকা বের করতে লাগলাম।

তিনি বললেন, 'দাঁড়ান, একসঙ্গে যাই, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

হেসে বললাম, 'না, তার দরকার হবে না, আমি একাই যেতে পারব।'

তাড়াতাড়ি করে বের হলাম খাবারের দোকানটা থেকে।

সামনে যে রিকশা পড়ল, তাতেই উঠে পড়লাম।

হায়, এত কষ্ট এত কান্নাই ছিল আমার বরাতে।

আজ আকাশটা মেঘে ঢাকা। মনে হয় সমুদ্রে নিম্নচাপ। বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি হলেই ভালো। অঝোর ধারায় ঝরে পড়া বৃষ্টিতে যদি ভিজতে পারতাম।

রিকশায় একা একা এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে বাসায় ফিরে এলাম। দরজা খুলে দিল মন্টি। চোখে একটা সানগ্লাস। মা'র সামনে পড়তে ইচ্ছা করছে না। দেখা হলেই নানা অবান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। লোকটা কী করে, বাড়ি কোথায়, বংশে পাগল আছে কিনা– এ জাতীয় প্রশ্ন।

দেখি মা ফোনে কথা বলছেন। বলুন, আরো কথা বলুন। কোনো অসুবিধা নেই।

শুনতে পেলাম, মা বলছেন, 'হ্যালো! কে। ভাবি! আর বলবেন না। আমার মন্টিটা রাস্তার ধারে ওয়েল্ডিং দেখে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। কাল থেকে চোখে কিছু দেখে না! আসবেন। দেখতে আসবেন। আজ রাতে সবার দাওয়াত!'

আমার ঘরে গেল মন্টি। চশমায় তাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে। ঠিক মানাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

মন্টি বলল, 'আপা! তোমার সেললেস হওয়া উপলক্ষে মা যতো পদ রেঁধেছিলেন, আমার চোখ ফোলা উপলক্ষে তার চেয়ে কিন্তু দু'পদ বেশি রাঁধা হচ্ছে! এর কারণ কী জানো!'

বললাম, 'জ্বালাস না তো মন্টি। আমাকে একটু একা থাকতে দে!'

মন্টি বলেই চলেছে, 'এর কারণ হলো, আমার চোখ জ্বালার পাশাপাশি একটা চশমাও জুটেছে। নতুন চশমা পাওয়া উপলক্ষে দুই পদ বেশি...হি হি হি।'

'বাসায় আজকেও খুব ভিড়ভাট্টা হবে মনে হচ্ছে!'

'নির্ঘাত। নির্ঘাত!'

'তাহলে মাকে বলে দে আমি নাসরিনদের বাসায় যাচ্ছি। আজ একটু ফিরতে রাত হবে!'

'তোমাকে পৌঁছে দেবে কে?'

'সে চিন্তা তোকে করতে হবে না!'

'আমার চোখটা ভালো থাকলে তো আমিই যেতে পারতাম!'

'তা তোকে নিয়ে যাচ্ছে কে? একটু ছাতা নিয়ে এগিয়ে দিতে গিয়েই চোখ নষ্ট করা সারা। যা ভাগ।'

মা ফোন রেখে এদিকে আসছেন। সর্বনাশ। আর দেখুন, আমাকে প্রথম কথাটা যা বললেন, তা হলো, 'এই ওনার মাথার পেছন দিকে তো চুল নাই।'

'কার?'

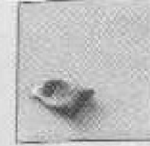
'কবিরুল সাহেবের। মাথায় টাক। বয়স তো বেশি মনে হচ্ছে।'

'বয়স দিয়ে তুমি কী করবে মা?'

'আমি আবার কী করব। দেখলাম একটা জিনিস। বললাম আর কি!'

'মা। আমার ভয়ানক মাথা ধরেছে, দয়া করে আমাকে একটু চুপচাপ শুয়ে থাকতে দাও।'

'থাক না শুয়ে। কে তোকে নিষেধ করছে। থাক।'



কবিরের কথা

আমার খুবই খারাপ লাগছে। আরে বাবা মেয়েটাকে তো আমি প্রথম দেখা থেকেই খুবই পছন্দ করি, নাকি! পছন্দ করি বলেই তার যেন কোনো কষ্ট না হয়, তিনি যেন কোনো দুঃখ না পান, সেটা তো আমাকেই দেখতে হবে, নাকি? অথচ দেখো কেউ আমার কষ্টটা বুঝছে না। আমি তো বলেইছি যে, সুনীলের কবিতাটা আমার জীবনের ব্রত– আমি এমনভাবে পা ফেলি যেন মাটির বুকেও আঘাত না লাগে, আমার তো কারুকে দুঃখ দেবার কথা নয়।

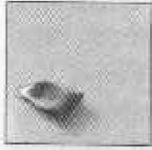
দেখুন মা'র দিকে! মা একেবারে বিছানা নিলেন। তিনি আমার সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলছেন না, ঠিকমতন ব্যবহার করছেন না। কথা না বলুন, খাওয়া-দাওয়া-গোসল তো ঠিকভাবে করবেন? না, তা না।

একা একা বকবক করছেন। বলছেন, আমাকে তো তুই অপমান করবিই। পেটের ছেলে, এইই তো মায়েদের জন্য ছেলেদের প্রতিদান। কিন্তু তুই বাইরের একটা মেয়েকে কেন অপমান করলি? ঠিক আছে, তুই তো বুঝলিই যে আমি ওকে খবর দিয়ে এনেছি, তাহলে তুই তাকে মিষ্টি কথা বলে বিদায় করে দে, তারপর যত খুশি আমাকে গালি দে, মার, কাট, যা খুশি কর। আর তুই কী করলি, তার সামনে আমাকে বকলি, আমার মান-সম্মানটা কোথায় থাকল? আর আমার সামনে তুই তাকে বকলি। আমি একটা মেয়েকে ডেকে এনেছি, আর তুই তাকে বকাবকি করে বের করে দিলি। এর পরেও আমি খাব? আরে আমার তো জীবনের ওপর থেকেই ভক্তি উঠে যাচ্ছে। যার জন্যে চক্ষুদান, সেই করে অপমান।

কাজেই আমাকে যেতে হলো তার কাছে ক্ষমা চাইতে। আমার চাওয়া আমি তো চেয়েছি। এর বেশি আমি কী করতে পারি।

মা তার ঘরে শুয়ে আছেন। এখন যাব তার কাছে। তিনি তো সবই জানেন, বোঝেন। কেন তিনি এ-রকম ছেলেমানুষের মতো ব্যবহার করছেন। আমার এত অসহায় লাগছে।

দেখি, তার পায়ে ধরে তাকে খাওয়াতে পারি কিনা?



হৃদিতার কথা

নাসরিন তার চুল কেটে ছোট করেছে। তাকে দেখতে লাগছে অদ্ভুত। না, খারাপ নয়। কিন্তু এত সুন্দর বড় বড় চুল ছিল নাসরিনের। ওর কী মনে হলো, পার্লারে গিয়ে চুলটা কেটে এল। একেবারে ঘাড়ের ওপর পর্যন্ত। ওর মা তো ভীষণ রেগে গেছেন ওর ওপরে। রাগে ওর সাথে কথাই বলছেন না। ও ঘোষণা করেছে, চুল যার, সিদ্ধান্ত তার। শরীর যার, পোলা তার। মা যদি এ-রকম করতেই থাকে, ও গিয়ে বয়কাট করে আসবে।

এইসব আলোচনা কি এখন আমার ভালো লাগে। ওর ঘরের দরজা বন্ধ করে ওর সঙ্গে গল্প করতে বসেছি। বললাম, 'নাসরিন, আমার সমস্যাটা শোন। তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।'

নাসরিন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'ঘটনাটা খুলে বল দেখি!'

বললাম, 'রিনা রে, আমার যে কেবল তার কাছে যেতে ইচ্ছে করে!'

'তাহলে যা!'

'আর কিছু না, শুধু মনে হয়, তার পাশে গিয়ে একটু বসে থাকি!'

'থাক গে না!'

'না হলে তার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। তিনি ছবি আঁকছেন, আঁকুন, আমি দূর থেকে দেখি!'

'দেখ!'

'আর কিছু নয়। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়! বল নাসরিন, এতে তার কী ক্ষতি!'

'আমি তো কোনো ক্ষতি দেখি না! আর বেশি কিছু করতে চাইলে তাকে বলবি, রাবার ইউজ করেন। নো ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। নো এইড্স। নো প্রেগন্যান্সি।'

'উফ নাসরিন। আমি কী বলি আর তুই কী বলিস?'

'আচ্ছা তুই ব্যাপারটা খুলে না বললে বুঝব কী করে? লোকটা তো মানুষ, নাকি বাঘ-ভাল্লুক কিছু!'

'মানুষ রে, খুব ভালো মানুষ! আমি তো মরেই গিয়েছিলাম, উনি আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন।'

'লোকটা কি অশিক্ষিত, গোঁয়ার, চাঁড়াল!'

'না না। খুব শিক্ষিত। জেন্টলম্যান।'

নাসরিন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'আমার মনে হয়, আমি সমস্যাটা ধরতে পেরেছি! কী করেছিস তুই হতভাগী! নিশ্চয়ই ম্যারিড। বউ আছে, বাচ্চা-কাচ্চা আছে!'

'না রে!'

'তাহলে!'

'সেটাই তো সমস্যা। সে বলছে না কেন সে আমার সঙ্গে জড়াতে চায় না।'

'নিশ্চয় তোকে তার পছন্দ নয়।'

'উঁহু। তাও না। সে তো লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ছবি এঁকেছে।'

'ভীষণ গোলমেলে ব্যাপার। তবে একটা ছবি আঁকলেই মনে করার কারণ নেই যে, সে তোকে ভালোবাসে। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি কি মোনালিসাকে বিয়ে করেছিল?'

'আমি কিছু জানি না। আমি শুধু জানি আমি তাকে ভালোবাসি। তাকে আমার চাই-ই চাই। এই দুনিয়ায় আমি তাকে চাই'– নাসরিনের গলা জড়িয়ে ধরে আমি গুনগুন করে বলতে লাগলাম :

প্রথমত আমি তোমাকে চাই
দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই
শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে চাই।

সে বলল, 'আমি ছেলে হলে তোকে বিয়ে করতাম। কিন্তু সোনামানিক, আমি তো ছেলে না। আমেরিকা হলে অবশ্য মেয়ে-মেয়েতেও বিয়ে হয়। কিন্তু এটা আমেরিকা না। আর আমার না ছেলেদেরই ভালো লাগে। আমি বিয়ে করলে একটা ডাণ্ডাওয়ালাকেই করব। গলাটা ছাড়, কাতুকুতু লাগে।'

'এখন আমি কী করব নাসরিন?'

'ভিসিডি দেখবি। ভালো সিডি আছে। কম্পিউটারে চালাব। এডাল্ট মুভি। বেসিক ইনস্টিংক্ট। খুব ভালো ছবি। শ্যারন স্টোনের।'

'না।'

'তাহলে কী দেখবি। ওই ছবিও আছে একটা। কিন্তু দেখতে ভালো লাগে না। তবে তুই দেখতে পারিস। মনে হচ্ছে তোর কাজে লাগবে।'

'মানে কী?'

'তিন নম্বর ছবি।'

'তিন নম্বর মানে? কার তিন নম্বর?'

'ও তুমি কিচ্ছু বোঝো না। বয়স হয়নি না। তোকে কেন উনি পছন্দ করছেন না এখন বুঝেছি। শোন পুরুষরা হলো দেহের প্রেমিক। আর মেয়েরা মনের। দেহ দিবি, আর ও মন দেবে। তুই শরীর দিবি না আর উনি ওনার মন দিয়ে দেবেন, এত ভালো পুরুষ মানুষ হয় না। আয় তোকে সিডি দেখাচ্ছি। মীরা নায়ারের বিখ্যাত সিনেমা

কামসূত্র। দেখলে বুঝবি। ছেলেদের পটাতে মেয়েদের হাতে ৬৪টা কলা দেওয়া আছে। আয় তোকে দেখাই।'

এখন আমার যা অবস্থা তাতে সিনেমায় মন বসে বলুন। আমি বললাম, 'নাসরিন আমি চলে যাচ্ছি। আর কোনোদিও যদি তোর কাছে আসি।'

বাসায় এখন হুলস্থুল কাণ্ড চলছে। মন্টি আর তার চার বন্ধু বসেছে ড্রয়িং রুমের মেঝেতে। চারদিকে ছড়ানো পোস্টার পেপার, রঙের ডিব্বা, তুলি আর পানি। মন্টির মুখে পর্যন্ত রং লেগে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মন্টি এসব কী হচ্ছে?'

মন্টি বলল, 'এটা হলো ডেঙ্গু প্রতিরোধ ক্লাব। আমরা ছোটরা মিলে এটা বানিয়েছি। দেখো, পোস্টার লেখা চলছে। মৃদুল কি সুন্দর লিখতে পারে দেখেছ। বড় হলে ও নিশ্চয় আর্টিস্ট হবে।'

আহ! আর্টিস্ট! সুন্দর হাতের লেখা! শুনলেই আমার দীর্ঘশ্বাস বের হয়। অজান্তেই। 'দেখি তোরা কী লিখছিস?'

পরিষ্কার জমানো পানিতে ডেঙ্গু হয়।
টবে টায়ারে ক্যানে পানি জমতে দেবেন না
ডেঙ্গু প্রতিরোধ ক্লাব, কলাবাগান

আমি বললাম, 'মৃদুল, তোমার হাতের লেখা তো রিয়েলি সুন্দর। তুমি ছবি আঁকো।'

মৃদুল লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

ওকে সহজ করার জন্যে বললাম, 'শোনো তোমরা আরেকটা কথা লেখো, ওয়েন্ডিং তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন না।'

মন্টি বলল, 'ইস্, আমাদেরটা তো ডেঙ্গু ক্লাব।'

আমি বললাম, 'এই আইডিয়া তোরা কোথায় পেলি?'

মন্টি বলল, 'কোন আইডিয়া?'

বললাম, 'এই যে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ক্লাব।'

মন্টি বলল, 'আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের কাছ থেকে। স্যার কালকে আমাদের স্কুলে এসেছিলেন। বললেন, পাড়ায় পাড়ায় ছোটদের এগিয়ে আসতে হবে। বড়রা তো ভালো কিছু করবে না। তাদের সময় নেই।'

ঠিক বলেছেন। বড়দের এত সময় কোথায়?

আমি নিজের ঘরে চলে গেলাম।

কী করব কিছুই বুঝছি না। আমাদের ক্লাসের দুটো মেয়ে আছে মাঝে মধ্যে গাঁজা খায়। আমরা যখন সার্ক ট্যুরে গিয়েছিলাম, তখন জানতে পেরেছি। ওরা গাঁজাখোর ছেলেদের সাথে আলাদা হয়ে গেল। আমরা বিভিন্ন শহরে গিয়ে ইউনিভার্সিটির

ডর্মিটরিতেই উঠতাম, থাকার জন্যে আলাদা আলাদা রুম তো আর পাওয়া যেত না। ফলে ওই মেয়ে দুটো যে গাঁজার গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারত, তা নয়। গাঁজা খেলে কী হয়? ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করব নাকি?

মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে মনে হয়।

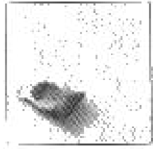
নাকি শালা হামিদ পালোয়ান স্যারকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাব। হামিদ স্যার ক্লাসে খুবই মজা করে পড়ান, তার ক্লাসে আমরা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাই, আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে স্যার স্কলারশিপ নিয়ে বিলাত যাচ্ছেন, তার ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো, নিজেদের চাঁদার টাকায় স্যারের জন্যে আড়ং-এর পাঞ্জাবি কেনা হলো, সবচেয়ে বড় সাইজেরটা, আরো কত কি উপহার-সামগ্রী– সব আড়ং-এর, তারপর অনুষ্ঠানে শুরু হলো কান্না, সবাই কাঁদতে লাগল। এত জনপ্রিয় এই স্যার। কিন্তু স্যার খুবই মোটা, এত মোটা যে স্যার যখন ক্লাসরুমে আসেন, মেঝে থরথর করে কাঁপতে থাকে, আমাদের ভয় লাগে, দালান না আবার ভেঙে পড়ে। স্যার একবার আমাকে ইনিয়ে-বিনিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমার খুব মায়া লেগেছিল। এত মোটা একটা মানুষকে বিয়ে করব, ভাবতেও পারি না, আবার এত মজার মানুষকে কষ্ট দিতেও ইচ্ছা করে না। নাসরিন বলল, ভালো হবে, তুই যদি হামিদ পালোয়ান স্যারকে বিয়ে করিস, চিড়া-চ্যাপ্টা হয়ে যাবি, আমাদের আর টাকা দিয়ে বাজার থেকে চিড়া কিনতে হবে না। যাহোক বিয়ে করা মানে তো আর কাপড় কেনা না, তাই গোড়াতেই ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলাম। তাকে জানিয়ে দিলাম, প্রশ্নই আসে না।

আমার মাথা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে, কোনো সন্দেহ নেই। আমি এখন যে কোনো কিছু করে বসতে পারি।

সন্ধ্যার সময় একটা ফোন এল। খালাম্মা অর্থাৎ কবির সাহেবের মা করেছেন। তার সঙ্গে কথা হলো খানিকক্ষণ। তিনি ক্ষমা চাইলেন এবং তার ছেলে কেন এ-রকম বাজে ব্যবহার করল, তার একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন। শুনে আমার পৃথিবী থমকে গেল। মনে হচ্ছে সব কিছু উল্টে গেছে। আমার পা ঝুলে আছে ছাদ থেকে। ফ্যান গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে মেঝে থেকে। ট্যাবের পানি নিচ দিক থেকে উঠছে ওপর দিকে।

সারা রাত আমি এক ফোঁটা ঘুমও ঘুমাতে পারলাম না।

শুধুই এপাশ ওপাশ করেছি। কত কি ভেবেছি। কত কান্নাই না নিজের ভেতরে কেঁদেছি। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। তারপর ভেতরে ভেতরে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।



কবিরের কথা

ভালোই ছিলাম।

ছবি আঁকছি। গান শুনছি। ওষুধ খাচ্ছি। মার সেবা যত্ন পাচ্ছি।

হৃদিতা মেয়েটা বেশ কয়েকদিন হলো আর যোগাযোগ রাখছেন না। রাখবেন কী করে? যে রকম আঘাত তিনি পেয়েছেন। এরপরে আমিইবা তাকে মুখ দেখাব কী করে?

তবে মেয়েটাকে আমি ভুলতে পারি নি। পারা সম্ভবও না। সারাক্ষণই আসলে তাকে মনে পড়ে। মনে মনে বলি, আ রে মেয়ে চলে এসো। আমি না হয় একটু এরকমই, তাই বলে তুমি কি সব ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে চলে আসতে পারো না।

আসলেই মানুষের মনের মতো রহস্যময় ব্যাপার আর কিছু নেই। যাকে আমি মুখে বলি, কাছে এসো না, মনে মনে সারাক্ষণই তাকে কাছে পেতে চাই। ভাবি একটা আর করি আরেকটা। করি একটা আর বলি আরেকটা।

একেকবার মনে হয়, যাই, মেয়েটাকে দেখে আসি। এমনি কথা বলতে, বন্ধুত্ব করতে কী অসুবিধা? মানুষ মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না?

আস্তে আস্তে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েও কী করে তাকে ছাড়াই চলা যায়, এই কায়দাটা রপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

মা'ও আর তার কথা বলেন না।

ভালোই ছিলাম। বেশ কিছুদিন

বিরতিটা এত বেশিদিনের যে তাকে আমি ভুলেও যেতে পারতাম! যদি না তিনি হৃদিতা হতেন।

হঠাৎ একদিন তার ফোন।

ফোন বেজে উঠলেই অবশ্য আমি মনে মনে প্রার্থনা করি, যেন তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। আজ আমার প্রার্থনা পূর্ণ হলো।

আমি হ্যালো বলতেই ওপার থেকে ভেসে এল সেই কিন্নর কণ্ঠ, 'আমি হৃদিতা। কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনি ভালো তো?'

'আমি আপনাকে ফোন করেছি একটা কথা বলার জন্যে। আসলে কথাটা ফোনে

বলাটা ঠিক হবে না। আমি কি আপনার বাসায় একটু আসতে পারি? দু'মিনিটের জন্যে?'

মন বলছে, আসুন আসুন, মুখ বলছে, 'আমি যে ইদানীং খুব ব্যস্ত।'

'এক মিনিটের জন্য?'

'আচ্ছা আসেন।'

'আজকেই আসছি তাহলে। বিকালে।'

ফোন রেখে দিলাম। হাত-পা নিঃসাড়। শরীর বলহীন। বুক কাঁপছে। শুধু মনে হচ্ছে কী হতে পারে? কেন আসতে চাইছেন হৃদিতা? তবে কি বিয়ের কার্ড দিতে? কোনো আমেরিকা-প্রবাসী বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে, তিনি সেটা দেখিয়ে প্রতিশোধ নিতে চান?

ভাবতেই মনটা বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আবার মনকে বলি, তিনি যদি ভালো থাকেন, তাহলে কি তোমার খুশি হওয়া উচিত নয়? ভালোবাসলে স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হয়।

বিকালবেলাটা আজ অনেকটাই হলুদ। নভেম্বর শেষ হয়ে এল, তবু তেমন শীত পড়েনি। হয়তো অগ্রহায়ণের বিদায়ের জন্যে অপেক্ষা করছে। পৌষে পড়বে। নাকি মাঘের আগে ঢাকায় ঠাণ্ডা পড়বে না?

তবে বিকালবেলাটা আজ অনেকটাই হলুদ।

আমাদের বাসার ভেতরে বাইরে যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছি তার পাতাও বিবর্ণ হয়ে এসেছে। আকাশে রঙিন মেঘ। তারই হলুদ আলো পড়েছে পৃথিবীতে। এই আলোকে বলে কনে দেখা আলো। কেন এসব মনে হচ্ছে? প্রকৃতিও কি পরিহাস করছে আমার সঙ্গে?

আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি গেটের দিকে। বার বার ঘড়ি দেখছি।

কখন যে তিনি আসবেন?

নাকি তিনি আমাকে বোঝাতে চাইছেন, প্রতীক্ষার কষ্ট কত অসহ্য। অপেক্ষায় থাকা কী ভীষণ যন্ত্রণাকর।

তারপর এক সময় বাইরের গেট নড়ে উঠল। তিনি আসছেন।

আমার বুক ভূমিকম্পের মতো কাঁপছে।

আমি দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললাম। তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তার চুল এলোমেলো। এলায়িত চুলে হলুদ আলো এসে পড়েছে।

বললাম, আসুন।

কী অবস্থা হয়েছে তার চেহারার। চোখের নিচে কালি। মুখখানি শুকিয়ে হয়ে আছে এতটুকুন। এই কয়েক দিনে একজন মানুষের স্বাস্থ্য এতটা ভেঙে পড়তে পারে। এযে অবিশ্বাস্য।

তিনি ভেতরে এসে বসলেন।

বললেন, 'খালাম্মা কই?'

বললাম, 'নামাজ পড়ছেন।'

'আচ্ছা, আমি তো আপনার কাছে শুধু এক মিনিট সময় নিয়েছি। কথাটা বলে শেষ করে চলে যাই।'

'আরে না। এসেছেন যখন, থাকেন কিছুক্ষণ। গল্প করেন। মা'র নামাজ পড়া শেষ হোক। মা'র সঙ্গে দেখা করে মা ছাড়লে তারপর যাবেন। তার আগে বলেন, আপনার স্বাস্থ্য এতটা খারাপ হলো কী করে?'

হৃদিতা গম্ভীর হয়ে গেলেন। ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আসলে আমি জানি না আপনাকে বলাটা উচিত হচ্ছে কিনা। তবু...যখন আপনি বিপদের আশঙ্কা করবেন, তখন কিন্তু আপনার ভয় লাগবে। কিন্তু যখন আপনি বিপদের মধ্যে পড়ে যাবেন, তখন আর আপনার ভয় লাগবে না। আপনি সিচুয়েশন ফেস করতে চাইবেন। জানি না কেমন করে কথাটা আমার আপনাকে বলা উচিত।'

হৃদিতা এবার মাটির দিকে তাকালেন। চোয়াল শক্ত করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার আর বেশিদিন সময় নাই। ডাক্তার বলে দিয়েছেন বড়জোর ৬ মাস।'

'কী বলছেন আপনি? আমি তো কিছুই বুঝছি না।' আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও কিছু হবে না, আমি জানি, কারণ আকাশ মানে শূন্য, কিন্তু এখন মনে হলো বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ল।

'বোঝার তেমন কিছু নাই। আমরা সবাই একদিন মারা যাব। কে কবে মারা যাব, এটা আমরা জানি না। আমার ক্ষেত্রে জানা গেছে যে আয়ু আর আছে ছয় মাস। বা তার কিছু বেশি বা কম।'

'রোগটা কী?'

হৃদিতা তার ব্যাগ বের করে একটা কাগজ বের করল। একটা ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরির মনোগ্রাম আঁকা। বায়াপসি রিপোর্ট। দেখলাম। ম্যালিগন্যান্সি পজিটিভ। রোগীর নাম হৃদিতা হক।

মনে হলো আমার চারপাশটা অন্ধকার হয়ে আসছে। মনে হলো, এ পৃথিবী একদিন পেয়েছিল তারে, কোনোদিন পাবে না আবার।

বললাম, 'কোন ডাক্তার?'

'ডাক্তার তালুকদার।'

'উনিই ভালো।'

'আপনাকে এ-কথাটা জানাতে চাইনি। ফার্স্টলি ডাক্তারদের কনফিউশন ছিল। সেকেন্ডলি আমি চাই না যে কেউ আমাকে করুণা করুক। কিন্তু কী মনে হলো, আপনাকে না জানিয়ে পারলাম না। আসলে মনটা একটু দুর্বল হয়ে গেছে। এ সময় প্রিয় মানুষগুলোর কথা বার বার মনে পড়ে। ঠিক আছে। আজ আমি উঠব। খালাম্মার

সঙ্গে আজ বোধ হয় আর দেখা হলো না।'

'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'ক্ষমার কথা আসছে কেন?'

'না জেনে না বুঝে আমি আপনাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি।'

'কী বলেন! আমি খুব সাধারণ মেয়ে। সাধারণ ঘরের। আমাকে কেনইবা আপনি পছন্দ করবেন, কেন প্রশ্রয় দেবেন!'

আমার খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে ওর অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী। অথচ আমার বাইরের আচরণটার কথাই সবাই ভাববে, জানবে। আমার অন্তরের কথাটা কেউ জানবে না। আমার কী করা উচিত, কী বলা উচিত কিচ্ছু বুঝছি না। আমি আমার ঘড়ির বেল্ট একবার খুলতে আর একবার বন্ধ করতে লাগলাম।

এই মেয়ে আর কিছুদিন পরে মরে যাবে। আমার মনে হলো, তাই বোধহয় প্রকৃতির নিয়মসম্মত। শি ইজ টু গুড এন্ড টু বিউটিফুল টু সারভাইভ। এ পৃথিবীর তুলনায় সে একটু বেশি ভালো। এ রকম ভালো একটা মেয়েকে ধরে রাখতে পারবে, পৃথিবী এখনও অতোটা যোগ্য হয়ে ওঠেনি।

আমার বুকে যেন পাথর চেপে বসছে। আমার গলায় যেন বাষ্পের দলা জমা হচ্ছে। আমার চোখে যেন গরম জল বাঁধ ভাঙতে চাইছে। আমি নিজেকে দমন করতে চাইছি। কিন্তু পারছি না। দূর ছাই। এত হিসাব করে দুনিয়া চলে? আমার যা করতে ইচ্ছা করছে, করব। প্রমত্ত নদকে কে পেরেছে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে গতিরুদ্ধ করতে? না সেটা করা উচিত? আমার সংযম আর গম্ভীরতার মুখোশ চুলোয় উঠল। আমি আস্তে করে উঠে তার হাত ধরলাম। বললাম, 'আপনি একটু আমার সঙ্গে ও ঘরে আসেন।'

'কেন?'

'আপনার সম্পর্কে আমার মনের আসল কথাটা কী, সেটা দেখাব।'

'না। আমাকে কেউ করুণা করুক, আমি চাই না।'

'না না করুণা নয়। চলেন আমার সঙ্গে...তা হলে আপনার জবাব আপনিই জেনে যাবেন। আসেন।'

আমি তার হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলাম আমার ছবি আঁকার ঘরে। তার হাতের সঙ্গে আমার হাতের স্পর্শে আমার শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে লাগল।

তার সামনে মেলে ধরলাম আমার স্কেচবুক। তাতে তার অনেকগুলো পোর্ট্রেটের পেন্সিল স্কেচ। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্কেচগুলো দেখলেন। (সাবধানে খাতাটা খুলতে হলো। মেয়েদের কিছু ন্যুড স্কেচ আছে। তিনি না আবার সে সব দেখে ফেলেন।) আর তাকে নিয়ে গেলাম জানালার কাছে। দরজা থেকে দেখা যায় না এমন অবস্থানে রাখা পেইন্টিংটার কাছে।

ক্যানভাসে আঁকা তার পোর্ট্রেটের দিকে এক পলকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ দিয়ে জল নামতে লাগল। বলল, আমি তো অত সুন্দর নই। আপনি আমাকে

বেশি সুন্দর করে এঁকেছেন। যাক, আমি থাকব না, আমার ছবি থেকে যাবে। আপনি তো এ ছবি ফেলেই দেবেন। এক কাজ করবেন, আমার আব্বাকে ছবিটা দিয়ে দেবেন। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন।

আমার মনে হচ্ছে এই ঘর ভরে উঠছে গোলাপের গন্ধে, আমি জানি না কোথেকে এই গন্ধ আসছে, তার দেওয়া গোলাপগুলো তো অনেক আগেই ঝরে শুকিয়ে ঘর থেকে বিদায় নিয়েছে।

আপনারা যারা প্রেমে পড়েছেন, কিংবা ভবিষ্যতে পড়বেন, আপনাদের কি এরকম হয় বা হবে? অজানা উৎস থেকে আসবে গোলাপের গন্ধ, আর চোখ দুটো কারণে-অকারণে ভরে উঠবে জলে।

আমার নিজের চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠল। গলা এল ধরে। আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। শুধু মনে মনে বললাম, 'হৃদিতা, তোমার দু'চোখের জল আমি মুছে দেব। আমি তোমার দুঃখ বুঝি। তুমিই কেবল আমার বুকের দুঃখ বুঝবে।' (নাটকের সংলাপের মতো মনে হচ্ছে? মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত আসে, যখন তার মাহাত্ম্য কল্পকাহিনীকেও হার মানায়। মূক লোক কথা কয়ে ওঠে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সেই নিমেষ, *একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে, থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।)*

বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল এই নীরব অশ্রুবিসর্জনের মধ্য দিয়ে।

বললাম, 'মা আছেন, চলো, ও-ঘরে যাই।' (লক্ষ্য করবেন, আমি তাকে তুমি বলে ফেললাম। অবলীলায়। বলে খুব আরাম পেলাম।)

চোখ মুছে সে নিজেকে প্রস্তুত করল যেন। বলল, 'চলো।' (ছোট্ট একটা মেয়ে, কী স্পর্ধা, আমাকে তুমি করে বলছে। আর দেখুন আমিও যেন বাধ্য ছেলে, এই তুমি শুনে তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছি।)

মা ও-ঘরে একা একা বসে ছিলেন। গৃহপরিচারক মতিন তাকে বলে থাকবে যে বাসায় গেস্ট এসেছে। তিনি কী অনুমান করেছেন, তিনিই জানেন।

আমরা তার সামনে গেলাম। হৃদিতা লজ্জা পাচ্ছিল, মুখে অন্তত সে আভাস।

বললাম, 'মা, হৃদিতাকে আমার নতুন কাজটা দেখালাম।'

মা বললেন, 'পছন্দ করেছে?'

হৃদিতা বলল, 'হুঁ। তবে বেশি সুন্দর করে উনি এঁকেছেন।'

বললাম, 'না। কই আর সুন্দর করে আঁকতে পারলাম। আসলে মডেল সামনে সিটিং দিলে না ছবি সুন্দর হবে। এভাবে কী আর হয়?'

হৃদিতা বলল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি। কবে থেকে দিতে হবে বলেন।'

আমি বললাম, 'আপনি আপনি করছো কেন, তুমিই তো ভালো ছিল।'

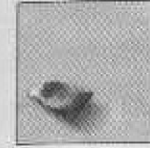
সে ইঙ্গিতে দেখাল মা-কে। বললাম, 'মাকে লজ্জা পাচ্ছ কেন। মাই সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন।'

মা হাসলেন। তাকে এত খুশি আমি জীবনে দেখিনি। আকাশে যেন মেঘ কেটে গিয়ে আলো ঝলমল করে উঠল। বহুদিন পরে।

মা বললেন, ফ্রিজে কী আছে না আছে, কে জানে? দাঁড়া, একটু মিষ্টিমুখ করাতে চাই।

মা দুধসেমাই আনলেন, আর আমার আর হৃদিতার মুখে দিলেন তুলে। ততক্ষণ বসে আমরা দুজন গল্প করতে থাকলাম। কী গল্প?

একটা সময় আসে, নারী-পুরুষ শুধু গল্পই করতে থাকে, কী গল্প তারা জানে না। জানলেও বাইরের লোককে বলার মতো কিছু না, তাদের দুজনের জন্যে এ সব গল্প খুবই মূল্যবান বটে, তবে অন্যদের জন্যে এসব বালখিল্য মাত্র।



হৃদিতার কথা

আজ আমি ঘরে ফিরছি বড় আনন্দপূর্ণ অন্তর নিয়ে। এর আগেও ওই বাসা থেকে ফিরেছি, কিন্তু যে-কোনো দিনের ফেরার সঙ্গে আজকের ফেরার আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আজ আমার নিজেকে রাজরানীর মতো মনে হচ্ছে। না, ঠিক বললাম না, মনে হচ্ছে বিজয়ী বীর। বিদেশ থেকে কোনো দল যখন চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি নিয়ে দেশে ফেরে, তখন তাদের যেমন প্রতি মুহূর্তটাকে গৌরবময় বলে মনে হয়, আজ আমার তেমনি বিজয়ীর বেশে ঘরে ফিরবার দিন। আপনারা কি মাঠজেতা ছেলের দলকে বল আর কাপ হাতে পথজুড়ে হইচই করতে করতে ফিরতে দেখেন নি?

রাত হয়ে গেছে। আজকাল বড় তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা তার যবনিকা ফেলে, ঝপ করে। এরই মধ্যে ইলেক্ট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অথৈ হয়ে পড়েছে। ধানমণ্ডির ফ্লাটবাড়িগুলোর জেনারেটরগুলো তাদের সশব্দ ডিউটি শুরু করেছে একযোগে। কিন্তু আমি থৈ হারাইনি। কারণ আমার সঙ্গে আজ আছে কবির। ড্রাইভারকে ছুটি দেওয়া হয়ে গেছে বলে এখন সে আমার সঙ্গে বেরিয়েছে রিকশায়। ধানমণ্ডি থেকে কলাবাগান এত্তোটুকুন পথ, রিকশায় সে যদি আমার পাশে এতটুকুন পথ যায়, তাতে গাড়িওয়ালার মহাভারত, আশা করি, অশুদ্ধ হয়ে যায় না।

রিকশাওয়ালা আমাদের নিয়ে চলতে শুরু করলে সে বলল, 'বাসায় ফিরে কী করবে?'

'জানি না। তোমার কথা ভাবব। তুমি?'

'জানি না। তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছা করছে না।'

'ছেড়ো না।' আমি ওর হাত ধরলাম আঁকড়ে।

'ভয় হচ্ছে যদি এটা স্বপ্ন হয়, ভয় হচ্ছে যদি তুমি আর কোনোদিন আমার কাছে না আসো।'

'ওমা। তুমি তো আমাদের বাসা চেনোই। বাসায় গিয়ে হাজির হবে।'

'বাসায় গিয়ে যদি দেখি... ধরো তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, তুমি বিদেশ চলেটলে গেছ?'

'ফিরে এসে একটা মেয়ে যোগাড় করে বিয়ে করে ফেলবে। ধাড়ি ছেলে, কাঁদতে বসবে নাকি?'

'শোনো। আরেকটু থাকো না আমার পাশে।' সে আমার হাত নিজের ঠোঁটে তুলে নিয়ে চুমু দিল।

'ঠিক আছে। রিকশাওয়ালা চলেন নিউ মার্কেট।'

'নিউ মার্কেটে গিয়ে কী করবে?'

'কিছু করব না। আরেকটা রিকশা নিয়ে যাব সংসদ ভবন। তোমার পাশে বসে থাকা হবে।'

'এই আমার তোমাকে আদর করতে ইচ্ছা করছে।'

'আমারও।'

'চলো বাসায় ফিরে যাই। মাকে বলব তুমি তোমার ব্যাগ ফেলে গেছ।'

'তারপর?'

'শটাশট একটা চুমু খেয়ে নেব। যাবে?'

আমার যেতে ইচ্ছা করছে, আমি সেটা বলি কী করে?

'চলো।' সে বলল।

'রিকশাওয়ালাকে ঘুরতে বলো।' আমি বললাম।

'রিকশাওয়ালা ভাই। চলেন ব্যাগ ফেলে এসছি। যেখান থেকে এসেছি, সেখানে চলেন।'

আবার ওদের বাসায়। কাজের লোক গেট খুলল। খালাম্মা টেলিভিশন দেখছেন। কবির তার অজুহাত জানিয়ে দিল। আর আমাকে তাই ব্যাগটা ওড়নার নিচে লুকিয়ে রাখতে হলো।

ওর ছবি আঁকার ঘরে ঢুকতেই উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ও তার দুবাহু বাড়িয়ে আমাকে ওর বুকের সাথে মিশিয়ে ফেলতে লাগল। (ভালোই তো পারো মিয়া, তাইলে এই কয়ডা দিন এত ভাব লইলা ক্যান।)

ও কি এখন আমাকে চুমু খাবে? আমি এর আগে আর কাউকে চুমু খাইনি। (বাচ্চাদের খেয়েছি। পুরুষের ঠোঁটে খাইনি।)

আমার সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার মুখ আমার মুখের দিকে নেমে আসছে। আমিও চাতক পাখির মতো আমার ঠোঁট উঁচু করে ধরলাম। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে নিজেকে উঁচু করে তার মুখের কাছাকাছি পৌঁছার চেষ্টা করতে লাগলাম।

তারপর সে আমাকে চুমু খেল।

এ কথার পিঠে প্রশ্ন আসতে পারে, ও-ই একা খেল, তুমি কি খাও নি?

এ এক ধাঁধাই বটে। আপনারা যে কাউকে প্রশ্ন করতে পারেন, বলতে পারেন, দুইজন লোক একটা জিনিস খেল। ভাগ করে। তারপর প্রত্যেকের ভাগে একটা করেই পড়ল, সেটা কী?

জি। ঠিক বলেছেন। চুমু।

আজ বেশি সময় নেই। আজ তাড়াতাড়ি সারতে হবে। 'চলো চলো, মা কি ভাববেন।' আমি তাড়া লাগালাম। সে আমার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'চলো।'

বাইরে বের হয়ে দেখলাম, একই রিকশাওয়ালা দাঁড়িয়ে।

আবার তার রিকশায় চড়ে চললাম কলাবাগানে আমাদের বাসার দিকে।

দোকানের আলোয় দেখতে পেলাম, কবিরের ঠোঁটে লিপস্টিক লেগে আছে। এরপর থেকে ম্যাট লিপস্টিক দিয়ে আসতে হবে। একটা টিসু পেপার ব্যাগ থেকে বের করে দিয়ে বললাম, মুখটা মুছে নিও।

সে বলল, 'যদি না মুছি...'

'এঁটো মুখে ভর সন্ধ্যায়, ভূত ধরবে, বলবে ঐই আঁমাকে এঁকটা দিয়ে যাঁ। পেতনির ডলা খেয়ো।'

সে হাসতে হাসতে বাঁচে না। 'তুমি এত কথা জানো।'

কী বলল? আমার পেটে শুধু কথা না? অনেক কথা। এক সমুদ্র কথা। ওলো সই, ওলো সই, আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো মনের কথা কই।

রিকশা বাসার সামনে পৌঁছলে আমি তার হাত ছেড়ে দিয়ে ভদ্র হয়ে বসলাম। বললাম, 'এই রিকশাতেই তুমি ফিরে যাও।' সে খোদা হাফেজ বলে তাকিয়ে রইল। আমার ইচ্ছা সে আগে যাক।

তার ইচ্ছা, ভাবে মনে হলো, আমি আগে যাই। এ-খেলাও খেলা যেত। কিন্তু আমাদের ফ্লাটের সামনে এ খেলা খেলাটা উচিত হবে না। কারণ ছয়তলা গ্যালারিভরা দর্শকরা হাততালি না দিয়ে উল্টো দুয়ো ধ্বনি দিতে পারে। কী দরকার বাবা?

আমি গেটের ভেতরে অন্তর্ধান করলাম।

বাসায় ড্রয়িং রুমে টেলিভিশনের সামনে আব্বা বসে আছেন। বললেন, 'মা কোথায় গিয়েছিলি? তোর মা বলল এই তো ৫/১০ মিনিটের মধ্যেই আসবে।'

'মা ঠিকই বলেছে আব্বা, ৫ মিনিটের জন্যে বাইরে গিয়ে আটকে গিয়েছিলাম। আপনি কি আমাকে কোনো কারণে খুঁজছিলেন।'

'না বিশেষ কোনো কারণে না। কমলা এনেছি অনেকগুলো। খেলে খা।'

'ঠিক আছে আব্বা। খাব। কত করে ডজন নিল।'

'সত্তর টাকা। বলল ইন্ডিয়ান কমলা।'

'ও।'

'তুইও নাই। মন্টিও নাই।'

'মন্টি কোথায় গেছে? ও আজকে তো আবার ওর বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে যাবার কথা। ওরা আজকে আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের সঙ্গে দেখা করবে। ডেঙ্গু ক্লাব।'

'তাই নাকি? একা একা আসতে পারবে। সাড়ে ছটা বাজে।'

'দেখেন এসে যাবে।' টুংটাং। 'ওই যে এসেই গেল বোধ হয়। ঠিকই। কেমন আয়ু হবে ওর। আব্বা আমি যাই কাপড় বদলাব।'

আব্বার সামনে থেকে সরে এলাম।

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার দিলাম ছেড়ে। আহ। আকাশ থেকে পানি আসছে না তো যেন আনন্দ ঝরে পড়ছে। সাবান ঘষলাম হাতে-পায়ে। তারপর মনের আনন্দে দাঁড়ালাম বেসিনের আয়নার সামনে। বাথরুমে একটা ক্যাসেট প্লেয়ার নিদেনপক্ষে একটা স্পিকার থাকা জরুরি। গান শুনতে শুনতে গোসল না করলে কী আর মজা করা হলো জীবনে।

আয়নায় নিজেকে দেখতে, সত্যি কথা বলতে কি, ভালোই লাগল।

ক্যাসেট যখন নেই-ই স্নানঘরে, অন্তত বাথরুম সিংগারের ভূমিকা পালন করতে দোষ কী? গাইতে লাগলাম, আমি তারায় তারায় রটিয়ে দেব তুমি আমার...

বাথরুম থেকে বেরিয়ে পড়লাম মন্টির গল্পের সামনে।

'আপা, আজকে যা মজা হলো না। স্যার আমাদের হাসাতে হাসাতে মেরে ফেলেন আর কী?'

'মেরে ফেলেন নি তো? মেরে ফেলাটা ঠিক হবে না। পুলিশ স্যারকে ধরে নিয়ে যাবে। স্যার তো আর মন্ত্রীপুত্র নন।'

'আপা তুমি এমন নিষ্ঠুরের মতো কথা বলো না?'

'নিষ্ঠুরের মতো বলে ফেললাম নাকি?'

'শোনো। মাথায় ময়লা ফেলা রহস্যের সমাধান করেছি। বাদামওয়ালাটা আজকে এলে সে বলে দিল চারতলার ডান দিকের ফ্ল্যাট। ব্যস, ধরে ফেললাম।'

'শুধু এতটুকুন ক্লু থেকে কি ধরা যায়?'

'না যায় না। বাদামওয়ালার কাছ থেকে ওরা দুই টাকার বাদাম পেত। কাজেই বাসাটা কনফার্ম।'

'তা তো হলো। কিন্তু একটা বিল্ডিংয়ে বাদামওয়ালা উঠলে আরো অনেক বাসায় বাদাম কেনার সম্ভাবনা থাকে।'

'কিন্তু আর কেউ কেনে নি।'

'কনফার্ম।'

'কনফার্ম। আপা তুমি আগে শোনো না সবটা। আজকে আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে ডেঙ্গুর লিফলেট নিয়ে আমরা ওই ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। ময়লার ব্যাপারটা আন্টিকে জানাতেই উনি বললেন, দাঁড়াও তোমাদের ক্রিমিনালকে ডেকে দিচ্ছি। তারপর ওদের কাজের মেয়েকে ডেকে এনে বললেন, আমারও সন্দেহ হলো, এক মিনিটে মাছের কাঁটাগুলো সব গেল কোথায়। নিশ্চয় ওপর থেকে ফেলেছে।'

'তাহলে তো মিটেই গেছে।'

'আন্টি আমাদের ক্লাবে একশ টাকা চাঁদা দিয়েছেন।'

'টাকা দিয়ে তোরা কী করবি?'

'আপাতত পোস্টার লাগানো ছাড়া তো কোনো কাজ দেখছি না। আপা একটা সমস্যা হচ্ছে। আমাদের ক্লাবের পোস্টার কে বা কারা ছিঁড়ে ফেলছে। পুরো পোস্টার না। শুধু ডেংগুর ডেং টুকু। আমাদের ক্লাবটা তাতে কী হচ্ছে তুমি বুঝছ?'

আমি তো হেসেই খুন।

'এ সমস্যার সমাধান কী?' মন্টি চিন্তিত।

'ডেংগু না লিখে ডেঙ্গু লিখলেই হয়। আর না হয়, ডেঙ্গি লেখ। ইংরেজিতে মনে হয় উচ্চারণটা ডেঙ্গি।'

'না ডেঙ্গুই ঠিক আছে। ডেঙ্গি লিখলে আবার যদি জেঙ্গি বানিয়ে দেয়।'

'ঠিক। শেষে একটা য়া লাগাতেও পারে। এখন যা এই ঘর থেকে। আমি একটু একা থাকি।'

'বাহ। আমি পড়তে বসব না?'

'পড়লে চুপচাপ পড়্। কথা বলা নিষেধ।'

'আচ্ছা।'

মন্টি চুপচাপ পড়ছে। আমি জানি সে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারবে না। সত্যি তাই। দু'মিনিটের মাথায় সে বলে বসল, 'আপা।'

'কোনো কথা না মন্টি।'

রাত ১২টার পর তার নম্বরে ফোন করলাম। কেউ ধরল না। মনে হয় রাতে রিংগার অফ করে রাখে। কোনো মানে হয়।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে হলো ফোন করা দরকার। কিন্তু এত সকালে যদি ও না ওঠে! আরেকটু দেরি করি। ক্লাস আছে আজকে। ক্লাস সেরে আসতে আসতে সেই দুটো। ততক্ষণ তাকে না দেখে তার সাথে কথা না বলে থাকতে হবে। এটা কি সম্ভব?

মাথার মধ্যে সারাক্ষণ এক চিন্তা ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করছে। একটা মধুর

অনুভব– যেন একটা মিষ্টি ব্যথার মতো, যেটা ব্যথা কিন্তু ব্যথার জায়গাটায় একটু চাপ না দিলে সেটা অনুভব করা যায় না, আর অনুভব করার জন্যে চাপ দিতে সারাক্ষণ ইচ্ছা করে– পরানে বাজছে।

তাহলে কি ক্লাসে না গিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হব?

সকালে আবার ফোন করলাম। না, এবারও ফোন বাজছে, কেউ ধরছে না। কী ব্যাপার, কোনো বিপদ-আপদ হলো না তো?

চিন্তিত মনে বের হলাম ক্যাম্পাসের উদ্দেশে। ক্লাসে মন বসছে না। দুটো ক্লাসের পর একটু বিরতি। সায়মার ব্যাগে মোবাইল থাকে। ওর স্বামী ভীষণ বড়লোক। মোবাইল ফোনটা ধার নিলাম।

ফোন করলাম। হ্যাঁ। এবার সে ফোন ধরল।

'এই তোমাদের ফোনের কী হয়েছিল, রাতে করলাম, সকালে দুবার, কোনো সাড়াশব্দ নেই।'

'ফোনের রিংগার কম করে রাখি। সকালে উঠে বাড়াতে ভুলে গেছলাম। তুমি কোত্থেকে?'

'ক্লাস থেকে। অন্যের মোবাইল ফোন। রাখতে হবে। তুমি ভালো আছ, জান?'

'আছি। তুমি?'

'ঠিক আছে এখন রাখি।'

সায়মা বলল, কী রে, কাকে ফোন করলি?

'সেটা তোকে বলতে হবে?'

'যদি তুই আমাকে বন্ধু মনে করিস।'

'বন্ধু মনে করি। তবে তার নামটা তোকে আমি এখন বলছি না।'

'কেন অসুবিধা কী?'

'কোনো অসুবিধা নাই। কাল বলব। আজ না।'

'আমি ইচ্ছা করলে এখনই নামটা বের করে ফেলতে পারি। করব?'

'পারলে কর।'

'সত্যিই।'

'ওমা সত্যি না তো কী? নাম বের করে ফেললে তো আর লোকটা ক্ষয়ে যাচ্ছে না।'

'গুড।'

আমি জানতাম না যে মোবাইল ফোনে ফোন নম্বরটা উঠে থাকে। সায়মা সাথে সাথে তার সেটের সবুজ বোতামে চাপ দিল আর কানে ধরে রইল।

সায়মা ফোনে বলছে, 'হ্যালো। আমার নাম সায়মা। আমি হৃদিতার ক্লাসমেট। এখনই হৃদিতা এই ফোন থেকে কথা বলেছে। শুনুন, ও আমার সামনে হাসছে। আমার বন্ধুটা খুব ভালো। তা ভাই আপনার নামটা জানতে পারি কি? আচ্ছা ঠিক আছে। পরে কথা বলব এখন। ঠিক আছে।'

আমি লাল হয়ে গেলাম।

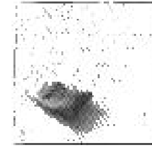
অন্য বন্ধুরা সবাই প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে ঘিরে ধরল সায়মাকে। 'কী নাম রে, কী নাম?'

সায়মা কাউকেই নাম বলল না।

পরের ক্লাস চলছে। স্যার লেকচার দিচ্ছেন। সায়মাকে লোপা চিরকুট পাঠাল, 'নামটা কী?'

সায়মা তাড়াতাড়ি করে নিচে লিখল– করিব। ব-এর ফোঁটাটা ঠিক জায়গায় না পড়ায় মহাকেলেঙ্কারি হয়ে গেল। সব মেয়েরা হাসতে লাগল। করিব। করিবি তো বটেই। কী করিবি?

ভাগ্যি ছেলেগুলোকে এই হাসির কারণ তারা জানায় নি।



কবিরের কথা

আজ আমরা বেড়াতে যাব। নদী দেখতে। বুড়িগঙ্গাতেই যাব। বেশি দূরে যাওয়াটা স্বাস্থ্যসম্মত হবে না। নদী দেখার আইডিয়াটা মাথায় এল গত পরশু *শিল্পাঙ্গনে* ছবি দেখতে গিয়ে। জয়নুল আবেদিনের প্রথম দিকের ছবি। জলরং। ওয়াশ। বর্ণময়।

হৃদিতা বলল, 'জয়নুলের এ রকম ছবি আছে জানতাম না তো।'

আমি বললাম, 'ব্রহ্মপুত্রের পাশে তার শৈশব কেটেছে। নদী তো তার ছবিতে থাকবেই।'

হৃদিতা বলল, 'এই কবির, চলো একদিন নদী দেখতে যাই। যাবে?'

বললাম, 'তোমার শরীর পারমিট করবে?'

হৃদিতার মনের জোর অসাধারণ। বলল, 'আ রে আমরা কি ব্রহ্মপুত্র দেখতে যাচ্ছি নাকি? বুড়িগঙ্গায় যাব। সকালে গিয়ে ১২টার আগে ফিরে আসব। যাবে?'

আমি রাজি হতাম না। কিন্তু হলাম। আমার অন্য মতলব আছে। হৃদিতাকে একটা কথা বলা ভীষণ দরকার। দেরি হয়ে যাচ্ছে। যত দেরি হয়ে যাচ্ছে, কথাটা বলে ফেলা ততই জরুরি হয়ে পড়ছে।

আজ সকাল ৭টায় ঘুম থেকে উঠে শেভ করে আমি রেডি। ড্রাইভারকে বলা

আছে। সে সাড়ে সাতটায় আসবে। বেরিয়ে পড়ব। কলাবাগানে গিয়ে হৃদিতাকে নেব।

ফোন এল। জানি, হৃদিতা।

'হ্যালো, তুমি রেডি।'

'হ্যাঁ। তুমি।'

'আমিও। শুধু স্যান্ডউইচগুলো এখন বানচ্ছি।'

'কেন? স্যান্ডউইচ কেন?'

'বাহবা। গঙ্গার রুচিকর আবহাওয়ায় যদি বাবুর খিদের উদ্রেক করে।'

'খিদে লাগলেই খেতে হবে?'

'হবে না?'

'যদি ওই খিদে পায়?'

'কোন খিদে? ওরে বদমাস।'

'আর যদি পিপাসা পায়?'

'গঙ্গার পানি খাইয়ে দেব।'

'ইস গঙ্গা গঙ্গা করছ কেন? এটা তো বুড়িগঙ্গা।'

'কেন তোমার বুঝি সব সময় ইয়ং লাগে?'

'লাগেই তো। দেখো না বুড়ো বয়সে কেমন ধরেছি।'

'শোনো, মিনারেল ওয়াটারের বোতল কিনে নিতে হবে।'

'নিলাম।'

'চা নেব ফ্লাস্কে। আর কিছু।'

'সাঁতার জানো?'

'না।'

'তাহলে লাইফ জ্যাকেট নাও।'

'কোথায় পাব?'

'ঠিক আছে। আমিই তোমার লাইফ জ্যাকেট হব।'

'ঠিক যেন মনে থাকে।'

'থাকবে।'

'নাহলে দেখো কিন্তু।'

'কী দেখাবে?'

'ডুবে মরে পানি-ভূত হয়ে এসে তোমার ঘাড় মটকাব।'

'তা করতে হবে না দেবী। কারণ তার আগেই সংবাদপত্রগুলো মেরে ফেলবে। পানিতে মেয়েমানুষ ডুবিয়ে মেরে কেউ স্ক্যান্ডাল থেকে বাঁচতে পারে নি।'

'কী খালি মরা মরা করছ? বের হও।'

'ঠিক আছে। তুমি ৫ মিনিট পরে নিচে আসো।'

ড্রাইভারকে নিয়ে বের হলাম। হৃদিতাদের বাসার সামনে গিয়ে গাড়ি ঘোরাতে না ঘোরাতেই সে এসে হাজির। হাতে একটা ইয়া বড় পলিথিনের ব্যাগ। ই বাব্বা। হৃদিতা আজ পরেছে কী? জিন্‌সের প্যান্ট। ওপরে একটা ফুলহাতা পুলওভার। সুতির। লাল রঙের। মাথায় একটা সাদা ক্যাপ। চোখে সানগ্লাস। আমি দু'চোখ ভরে তাকে দেখে নেই। সে গাড়িতে উঠলে গাড়ি স্টার্ট নিল।

'জয়নাল, ক্যাসেট ছেড়ে দাও একটা।'

হৃদিতা একটা ক্যাসেট তার হাতব্যাগ থেকে বের করে বলল, 'চিরটাকাল তো রবীন্দ্রসংগীত শুনলে, এবার অন্য কিছুও একটু শুনে দেখো।''

আমি বললাম, 'ব্যান্ডের গান?

'হ্যাঁ।'

তোমরা যে কী মজা পাও না এসবে।

সে হাসতে হাসতে বলল, 'জেনারেশন গ্যাপ। মে কিয়া করু রাম মুঝে বুড়া মিল গায়া। ধরো তুমি যদি মেয়ে হতে, আমার সমান তোমার একটা ছেলে বা মেয়ে থাকত। সে হিসেবে পুরা একটা জেনারেশনের গ্যাপ তোমার সঙ্গে আমার। ব্যান্ডের গান তোমার কখনও ভালো লাগবে না। কিন্তু ধরো যখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন, রবীন্দ্রসংগীতকেও ওস্তাদরা অচ্ছুত ভাবতেন, অশ্লীল ভাবতেন, বলা হতো এ হচ্ছে লঘু সংগীত। আবার এখন আমরা যারা ব্যান্ডের গান শুনি, তাদের তোমরা ভাবো অবুঝ, শ্যালো। আমরা কী মজা পাই, আমরাই জানি। তোমাকে একটা গান শোনাই। শোনো, বাংলাদেশের ব্যান্ডের গান।'

গান বাজতে লাগল :

আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিল চাঁদ
আমাকে নিঃস্ব করে দিয়েছিল চাঁদ
মেয়ে তুমি এভাবে তাকালে কেন
এমন মেয়ে কী করে বানালে ঈশ্বর

'কেমন ভালো না?' হৃদিতা জিজ্ঞেস করল।

'ভালো। কার গান?'

'দলছুট।'

'তোমাকে নিয়ে লিখেছে গানটা?'

'ধেত্তেরি।'

রাস্তায় এখনও জ্যাম তেমন বাঁধে নি। গাড়ি চলেছে। একবারে পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থির বেগ আর আবেগ নিয়ে।

সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে সদরঘাট পৌঁছে গেলাম। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে এগুতে

লাগলাম নদীর সন্ধানে। নৌকা পেতে ঝামেলা হলো। কিন্তু এখন কোনো ঝামেলাই ঝামেলা মনে হচ্ছে না।

নদীর বুকে এখনও কুয়াশা-কুয়াশা ভাব। সূর্য তেমন সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হয় না। আমাদের নৌকাটা ইঞ্জিনওয়ালা নৌকা। এক পাশে একটা ছইও আছে। মাঝি দুজন। একজন বড়ো। একজন পিচ্চি।

নদী ধরে সোজা যাচ্ছি দক্ষিণে। এভাবে এক ঘণ্টা যাব। তারপর দাঁড়াব। আধ ঘণ্টা থাকব। তারপর আবার ফিরে আসব। এই হলো প্ল্যান।

দু'ধারে ঢাকা শহরের নানান নির্মাণ। এখানে পানি নোংরা-নোংরা। পানির গন্ধটাও সুবিধার মনে হলো না। মাথার ওপরে ব্রিজ। কল-কারখানা। বড় বড় লঞ্চ। আর নৌকা। নদী দেখলে কেমন লাগে না? মনে হয় না, এই যে একেকটা নৌযান একেক দিকে যাচ্ছে, হায় কার কী গন্তব্য? কার ছেলে কার বউ কার স্বামী কার মা কোথায় পথ চেয়ে বসে আছে। সবচেয়ে হাহাকার লাগে পণ্যবাহী নৌযান দেখলে। কতদিন ধরে এইসব নৌযানে এই সারেংরা, মাঝিরা বাস করছে। তারা কি কোনোদিনও তাদের প্রিয়জনের কাছে পৌছবে না? কে যাস রে, ভাটি গাঙ বাইয়া, আমার ভাইজানরে কইয়ো নাইয়োর নিত আইয়া।

এক ঘণ্টা পরে যে জায়গাটায় আমরা গেলাম, তার নাম জানি না। জানতে চাইও না। শুধু বলি, ইঞ্জিন বন্ধ থাকবে। ভটভটির জন্যে কথা বলা যায় না।

নদীর মধ্যখানে প্রায়, নৌকা ভাসছে, স্থিরভাবে। এখানকার পানি অনেকটা পরিষ্কার। একটা ফড়িং আমাদের নৌকার ওপরে উড়ছে। মাছরাঙা পাখি জলে ডাইভ মারছে।

কী সুন্দর দৃশ্য। হৃদিতা হাততালি দিয়ে উঠল। তারপর ব্যাগ থেকে খাবার বের করে আমাকে দিল। বলল, নিজের হাতে বানানো জনাব। খেয়ে দেখুন। পানি কিনতে যথারীতি ভুলে গেছি। চা দিয়ে পানির কাজ চালাতে হলো। এমনকি কাপ ধোওয়ার কাজও সারতে হলো চা দিয়েই।

চা পানের বিরতি শেষে আমরা ছইয়ের কাছে গেলাম।

হৃদিতা আমার কোলের মধ্যে মাথা দিয়ে আকাশ দেখছে। ছইয়ের ছায়া এসেছে তার মুখে, ফলে ব্যাপারটা আরামদায়ক পর্যায়ে আছে।

হৃদিতাকে আমার কথাটা বলতেই হবে। আজই । এখনই।

'হৃদি, তোমাকে একটা কথা বলব।'

'এত সুন্দর দিন। এত সুন্দর চারপাশ। এখন আবার কথা কী?'

'জরুরি কথা। আমাকে যে বলতেই হবে।'

'দেখো দেখো মাছরাঙাটা সত্যি একটা মাছ পেয়েছে। কী মাছ বলো তো?'

'জানি না। শোনো, একটু শোনো।'

'বলো।'

'তার আগে একটা কৌতুক বলে নেই। এক তোতলা লোক ট্রেনে আরেক তোতলাকে জিজ্ঞেস করলো– কো কো কো কোথায় যাবেন। দু'নম্বর তোতলা জবাব দিল না। কারণ প্রথম তোতলা ভাবতে পারে ইয়ার্কি করছে...

'কী বলতে চাও বলো না বাবা।'

'আমারও দিন আর বেশি বাকি নেই!'

'মানে?'

'হার্টের একটা সমস্যা আছে। কার্ডিওমায়োপ্যাথি। হার্টের পেশিগুলো ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। একটা ভাইরাস-জ্বরের পর এটা হয়েছে। এমনিতেই রেগুলার হার্ট চেক করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ব্যাংককে গিয়েছিলাম। ইন্ডিয়ায়। সব ডাক্তার এ কথা বলল। ভালো হবার নয়। চিকিৎসা নাই। এখনও ভালো আছি। তবে অবস্থা দিন দিন খারাপ হবে। ডাক্তাররা আশা করেন, বছর খানেক টিকব।'

হৃদিতা আমার কোল থেকে মাথাটা তুলে সোজা হয়ে বসল। তার দু'চোখে জলের বন্যা।

'ডাক্তার আসলে বাড়িয়ে বলেছেন। আমি ইন্টারনেটে নানা মেডিক্যাল জার্নাল ঘেঁটে পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে জেনে গেছি। আমার আয়ু আসলে বড় জোর ছয় মাস! ধীরে ধীরে হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। আসলে তুমি যে আমার কাছে এতবার এসেছ, আর আমি তোমাকে বারবার ফিরিয়ে দিয়েছি, সেটা এ জন্যেই। আমি চাই নি, একজন মৃত্যু-পথযাত্রীর সঙ্গে তুমি জড়িয়ে পড়ো। তোমার বয়স কম, তোমার সামনে ঝলমল করছে ভবিষ্যত। তুমি কেন এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে মেলাবে। তারপর যখন শুনলাম, তোমারও একই অবস্থা, তখন আর কী। ভেতরে ভেতরে তো তোমাকে আমি প্রথম দেখাতেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম।' আমি বললাম। কথাটা পাড়তে পেরে মনে হলো, বুকের ওপর থেকে একটা হাতির পা নেমে গেল।

'ভালো হলো! দুই অন্ধের হস্তিদর্শন। আমিও কাঙাল হলাম আরেক কাঙালের পেতে দেখা। আমি শুধু চাই, আমি যেন তোমার আগে মরতে পারি...'

'স্বার্থপরের মতো কথা বলছ! মরে গিয়ে বেঁচে যেতে চাও। আমি যেন তোমার আগে মরি।'

'সবচেয়ে ভালো হয় দুজনে যদি এক সাথে মরি...চলো লাফ দেই।'

'তারো চেয়ে ভালো হতো দুজনে যদি এক সাথে বাঁচতে পারতাম। তাতো আর হবার নয়...'

'আর ভালো লাগছে না। চলো ফিরে যাই।' হৃদিতা সাশ্রু নয়নে বলল।

'চলো। মাঝি ভাই চলেন ফিরে যাই। ইঞ্জিন স্টার্ট দেন।'

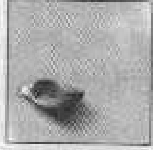
দড়িতে টান মেরে বয়স্কতরজন ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল। আমাদের ছইয়ের আশ্রয় ছেড়ে গিয়ে সরে বসতে হলো গলুইয়ে। ওখানে শব্দটা কম।

এবার উত্তর দিকে যাত্রা আমাদের। উত্তুরে বাতাস এসে গায়ে লাগছে। একটু

রোদ উঠেছে। বাতাসটা আরামই লাগছে।

বিশেষ করে চোখের কোণে যদি অশ্রু লেগে থাকে, তখন বাতাসটা বেশ আরাম দেয়। নাকের কাছটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে।

আমি গান জানি না। কিন্তু মাঝে মধ্যে গুনগুন করতে তো আর বাধা নাই। হৃদিতার চুল নাড়তে নাড়তে আমি গাইতে লাগলাম, পারে লয়ে যাও আমায়, আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়...



হৃদিতার কথা

আমার ইউনিভার্সিটির ক্লাস করা শিকেয় উঠল। ক্লাসের নামে বের হই। সকালে দু-একটা ক্লাস করি। তারপর চলে যাই ধানমণ্ডি। কবিরের বাসা। ওর শরীরটা ইদানীং আগের চেয়ে খারাপ হয়ে পড়েছে। যেদিন ও বেশি খারাপ বোধ করে, আমি ওর পাশে বসে থাকি। গান শুনি। ওর চুলে বিলি কেটে দেই। ওকে পানিটা ফলটা এগিয়ে দেই। ও বলে, 'এই তুমি আমার জন্যে এসব করছ কেন? আমি তো তোমার জন্যে কিছুই করি না। তুমি আমি একই পথের পথিক। তাহলে এক যাত্রায় দুই ফল হবে কেন।'

আমি বলি, 'আমাকে আমার ডেসটিনি মনে করিয়ে দেবে না প্লিজ। আমি হলাম জীবনবাদী। যতদিন আছি, ততদিন এনজয় করব। দি রেস্ট অব মাই লাইফ শুড বি ফুল অব লাইফ। আর সেবা-যত্ন করার কথা বলছ? আমি তোমার জন্যে কিছুই করিনি। আমাদের ট্রাডিশনটা ভেবে দেখো। পুরুষের জন্যে আমাদের মহিলারা কত রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। তারা কত কি করেছে। আমি তো সে তুলনায় একেবারে তোলা চাদর। আলমারিতে তুলে রাখা। ইস্ত্রির ভাঁজটা পর্যন্ত ভাঙা হয়নি।'

কবির আমার সেবাটুকুন, যত্ন-আত্তিটুকুন উপভোগ করে। সামান্য ব্যাপার। এক গ্লাস পানি ঢেলে খাওয়ালে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কিন্তু তার বদলে পাওয়া ওর কৃতজ্ঞতা-ভরা চোখের দৃষ্টিটা যদি দেখতেন।

ওষুধ খেয়ে নিয়ম-কানুন মেনে ও আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

তখন, একদিন তার মনে পড়ল, 'এই আমার ছবির সিটিং-এর কী হলো?'

'বাহ্‌। তুমি আমার ছবি আঁকবে কি আঁকবে না, সেটা তোমার ব্যাপার। আর্টিস্টের ইগো আছে না। আমি ছোটলোকের মতো বলতে যাব নাকি, আমাকে আঁকুন না? হয়তো তুমি মুখের ওপর না করতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু পরে ছবি আঁকতে গিয়ে দেখা গেল, আঁকতে পারছ না। তখন কত বড় অপমান!'

'ঠিক আছে। আজ তাহলে বসো দেখি। আঁকতে পারি নাকি!'

তার ছবি আঁকার ঘরে গেলাম। সে রং, তারপিন নানা কিছু বের করেছে। একটা অন্য রকমের গন্ধ এ ঘরে। বোঝাই যাচ্ছে, এ হলো ছবি আঁকার ঘর। স্টুডিও।

সে চেয়ারটা এখানে ওখানে পেতে আমাকে বসিয়ে দেখে। কী দেখে সেই জানে। 'আচ্ছা এই জায়গায় বসো। জানালার আলোটা একপাশ দিয়ে পড়ুক।'

'আলো তো নড়ে যাবে। তখন কী হবে?'

'না। এটা তো ডাইরেক্ট সানলাইট নয়। সেভাবে নড়বে না।'

'বাড়বে কমবে তো?'

'তা করবে। তবু আর্টিফিসিয়াল লাইট দিয়ে করতে চাই না।'

ইজেলটা সরিয়ে ঠিক জায়গায় দাঁড় করাল। স্ট্রেচারে ক্যানভাস জুড়ল। আমাকে বসাল চেয়ারে। বলল, 'আরাম করে বসো। অনেকক্ষণ একই ভঙ্গিতে বসতে হবে তো। শোনো আমাদের এক ক্লাসমেট ছিল, মহাপ্রাণ বর্ণ বলতে পারত না। যেমন ভাতকে বলত বাত, ধানকে বলত দান। আমরা ওকে সব সময় পাঠাতাম মেয়েদের কাছে। যাতো ওকে গিয়ে বল, ওর ফ্রেমটা কোথা থেকে বানিয়েছে। নিজে করেছে নাকি অন্য কেউ করেছে। সে গিয়ে বলত, সাবিনা, তোমার প্রেমটা তো সুন্দর। প্রেম সুন্দর হলে *চবি* সুন্দর হয়। তোমার *প্রেম* তুমি নিজে করো, নাকি *প্রেম* অন্যে করে দেয়...হাহাহা...এই তো হেসেছ। এমনি হাসি হাসি মুখ ধরে রাখো।'

এরপর ও মগ্ন হয়ে গেল ছবি আঁকায়। আর আমাকে এখন এই হাসি হাসি মুখ ধরে রাখতে হবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হা, খোদা।

তবে একটাই সান্ত্বনা, ও আমাকে দেখছে। আমার চোখ আর মুখ। নাক কান চুল।

কিন্তু এ দৃষ্টি যেন পার্থিব কিছু নয়। যেন ও এই গ্রহে নেই।

আমি গান শুনেই কাটিয়ে দিলাম তিন দিনে মোট নয় ঘণ্টা এবং ও যাতে ডিস্টার্বড না হয়, সে জন্যে আমাকে শুনতে হলো রবীন্দ্রসংগীত। অনুচ্চ স্বরে। সত্যি কথা বলতে কী, এর আগে কখনও রবীন্দ্রসংগীত এত মন দিয়ে আমি শুনি নি। ভালোই লাগল। আসলে গানই বলুন, খাবারের রুচি বলুন, পড়ার অভ্যাস বলুন, সবই কিন্তু চর্চা করে অর্জন করতে হয়। প্রথম প্রথম যা খারাপ লাগে, একটু আন্তরিকভাবে চর্চা করলে পরে সেটাই পরম প্রিয় হয়ে ওঠে।

আর কোন গান যে কী কারণে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে, বলা মুশকিল।

যেমন যখন বাজছে, কণিকার কণ্ঠে:

মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ॥
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না–
ওই যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বলো কী করি ॥

মনে হলো এ তো আমারই অবস্থা। আমিও তো ঘরে থাকতে পারি না। ছুটে ছুটে আসি তার কাছে। তার মুখের হাসি দেখতে। তাকে একটা ফুলের তোড়া দিতে। আসলে বাংলার মেয়েদের রক্তে মনে হয় রাধার স্মৃতি রয়ে গেছে। এই গান তাই মর্মে বাজে, বাঁশি শোনা মাত্রই উদাস লাগে আর আমরা একবার হৃদয় দিয়ে ফেললে আর ঘরে থাকতে পারি না।

তিনটা ক্যাসেট তিনবার করে মোট নয়বার শুনলাম। মনের মধ্যে গেঁথে গেল।

ছবিটা সে ভালোই এঁকেছে বলতে হবে। তবে অনেক অন্ধকার। জানালা থেকে আসা এক ফালি আলো শুধু মুখের ওপর পড়ে একটা অংশ উজ্জ্বল করে রেখেছে। বাম চোখের ওপর দিয়ে নাকের নিচটা ছুঁয়ে ঠোঁটের ওপর দিয়ে চিবুকের একাংশ উজ্জ্বল করে রেখেছে ওই আলোর টুকরা।

কী জানি, এর মানে কী?

হয়তো শিল্পীর চোখে এই মুখটা এমনি আলো-আঁধারিতে ভরা।

বাসায় ফেরার সময় ওর কাছে ক্যাসেট ধার করে নিয়ে ফিরলাম। রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট। ওর সাথে প্রেম করে এই হলো আমার নেট লাভ। রবীন্দ্রসংগীতের ভক্ত হওয়া।

এর মধ্যে একদিন ও বলল, 'কাল মা থাকবে না। আমার বাসায় যাবে বেড়াতে। কাল এসো। কাল আমাদের স্বাধীনতা।'

আমি বললাম, 'স্বাধীনতা দিয়ে তুমি কী করবে? খালাম্মা থাকলে তো আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।'

ও বলল, 'অসুবিধা হয় না, সুবিধাও হয় না।'

'মানে কী?'

'যেমন ধরো তোমার ছবিটা আমি আঁকলাম। তুমি মডেল হলে। তোমার মতো এমন সুন্দর শিক্ষিত ইয়ুথফুল একজন মডেলকে পেয়েও কি আমি ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছি।'

'মানে?'

'মানে একটা ন্যুড সেশন কি তুমি দিতে পারতে না?'

'এই বদমায়েস। এ সব কী ধরনের কথা?'

'আরে আরে পৃথিবীর অনেক বড় আর্টিস্টের গার্লফ্রেন্ডরাই ন্যুড সেশন দিয়েছে। তাই না তারা এত বড় শিল্পী হয়েছে। আমাদের আর্ট ইন্সটিটিউটেই আমরা প্রফেশনাল মডেলদের দিয়ে ন্যুড সেশন করেছি। স্যাররা আমাদের গাইড করেছেন। এটা কোনো ব্যাপারই না।'

'আমি তো প্রফেশনাল মডেল না।'

'আরে তুমি তো ইন্সটিটিউটে গিয়ে সবার সামনে মডেল হচ্ছ না। তুমি আমার জান। আমি তোমার বডি। আবার আমি তোমার সোল, তুমি আমার বডি। আমাদের

আবার আড়াল কী?'

'কথা তো মেনি বিড়াল তুমি ভালোই জানো। তাহলে তুমি মডেল হও। আমি আঁকি।'

'আমার কোনো আপত্তি নাই।'

আজ খালাম্মা বাসায় নেই। আমি যাচ্ছি কবিরদের বাসা। আমার পেটের ভেতরটায় কেমন গুড়গুড় করছে। কেমন যেন একটা উত্তেজনা। আমি ঠিক এটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আজ কি সত্যি সত্যি আমাকে ন্যুড হতে হবে?

আজ আমি কী পরব? কেবল বাইরে নয়, ভেতরে!

নানা কিছু ভাবতে ভাবতে আমি ওদের বাসার গেটে হাজির। আজ দরজা খুলল ওদের কাজের লোক।

আমি সোজা কবিরের ঘরের দিকে গেলাম। সে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবি আর পায়জামা। মুখে হাসি।

পাঞ্জাবি-পায়জামাতে তাকে খুব মানিয়েছে। অবশ্য ওর ফিগারটাই সুন্দর। যে কাপড় সে পরে, তাই তাকে মানায়। লম্বা, সুন্দর স্বাস্থ্য, শ্যামলা গায়ের রং, আর গাঢ় ভুরুর নিচে দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

ঘরে গেলাম। বসলাম। বললাম, 'খালাম্মা কই?'

'কেন তুমি ভুলে গেছ? আজ না মা থাকবে না।' (ভুলে যাব কেন? তবু ব্যাপারটা কনফার্ম করলাম)

'সত্যিই গেছেন। তোমাকে দেখবে কে?'

'বিকালের মধ্যে এসে যাবে।'

আমার চেয়ারটা পর্যন্ত কাঁপছে, এভাবে হৃদকম্পন শুরু হয়েছে।

'রং টং সব রেডি করে রেখেছি। ওয়েল করা যাবে না। ওয়াটার কালার করব।'

'কেন, করা যাবে না কেন?'

'টাইম লাগে যে। তার আগেই মা এসে যাবে। এক কাপ চা খাবে?'

'খেতে পারি।'

'মতিন মতিন, দু'কাপ চা দাও।'

চা এল। সঙ্গে পাপর ভাজা। খাচ্ছি। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি। ধীরে ধীরে। আসলে সময় নিচ্ছি।

ও পর্দাগুলো লাগিয়ে দিলো। ঘরের মধ্যে এখানে ওখানে টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। চা খাওয়া হয়ে গেলে কাপ দুটো হাতে নিল। বলল, 'রেখে আসি।'

সেই মুহূর্ত কটা আমি দম নিলাম। শ্বাস নেওয়াটা যে একটা কাজ, এটা আমরা ভুলে থাকি। কিন্তু এ রকম মুহূর্তে শ্বাস নেওয়াটাকেও কাজ বলে মনে হয়।

ও এল। এসে দরজা লাগিয়ে দিল। ভেতর থেকে। লকড।

বলল, 'আমি রেডি।'

আমি ওর মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকালাম। কিন্তু কোথায় ও? ও তো এই জগতে নেই। এই মর্ত্যেই নয়। ও এখন আর্টিস্ট। শিল্পী। রক্তমাংসের পুরুষমানুষ থেকে ওর চোখ শিল্পীর চোখ হয়ে গেছে।

এ দৃষ্টি আমি চিনি।

এর আগে যখন তার সামনে পোজ দিয়েছি, কাজ শুরু করার পর ও যেন আর এই মাটিতে, এই বাড়িতে, এই দুনিয়ায় থাকত না।

তখন আমি কোনো প্রশ্ন করলে ও জবাব দেয় নি।

আমি আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম। আমার জামা-কাপড় খুললাম। যেমন করে খুলি, নিজের ঘরে, নির্জনতায়। একে একে সব। আর কোনো কাপড় রইল না শরীরের কোথাও। একটা সুতোও না। গলার চেইন, কানের দুলও না।

ও বলল, চেয়ারটায় বসো। ওই ঘড়ির দিকে মুখ করে।

বসলাম। ও আঁকতে লাগল।

ভেতরে ভেতরে আমি উত্তেজিত ছিলাম। ঘটানার স্বাভাবিকতায় উত্তেজনা গেল কেটে। এখন ঠান্ডা লাগতে শুরু করল। কিছুক্ষণ ঠান্ডা সহ্য করলাম। চুপ করে থাকলাম। তারপর বললাম, 'শীত লাগছে তো।'

ও খুবই লজ্জিত হলো। বলল, 'ছিঃ ছিঃ, আমার তো আগে খেয়াল করা উচিত ছিল। হয়ে গেছে। তুমি কাপড় পরে নাও।' এতক্ষণে এই প্রথম সে মাটিতে পা রাখল।

আর এতক্ষণ আমারও মোটেও লজ্জা-সংকোচ লাগছিল না। এখন, ও যখন, বাস্তবে ফিরে এসেছে বলে মনে হচ্ছে, আমারও কেমন লজ্জা লাগতে লাগল। উঠে কাপড় পরে নিলাম। ও দরজা খুলে দিল।

'দেখি, কী এঁকেছ?' কাছে গেলাম।

ও আজ আর চেহারায় জোর দেয় নি। বরং পেছন ফিরে তাকিয়ে আছি বলে চেহারা স্পষ্ট নয়। স্পষ্টতা শরীরে। বিশেষ করে চেয়ারটায়।

বলল, 'এখন তো বুঝতে পারব না আসলে কেমন হলো? কয়েকদিন পরে বুঝব। যদি মনে হয় ভালো হয়েছে তাহলে এটা সামনে রেখে ওয়েলে করব। ঠিক আছে? মডেলের কাছে আগে থেকেই পারমিশন নিয়ে রাখলাম।'

মডেল বলায় একটু রাগ লাগল। বললাম, 'মডেলের চার্জটা মিটিয়ে দেন স্যার।'

ও আমার মুখের দিকে চাইল। তারপর আমার হাত দুটো ধরে তার বুকে টেনে নিল। দু'হাত ধরে বুকে ঠেসে ধরে আমার দুটো ঠোঁট ওর মুখের ভেতর শুষে নিয়ে রাখল অন্তত এক মিনিট। তারপর বলল, 'এই হলো তোমার পারিশ্রমিক।'

আমি গলেই যাই আর কী!

কবিরের সঙ্গে আমার দিনগুলি ভালোই যাচ্ছে। কিন্তু বাসায় আমার দিন মোটেও ভালো যাচ্ছে না। আপনার সুখবর আপনাকে গাড়ি ভাড়া করে হাতে মিষ্টি নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, তাও সেটা সর্বত্র পৌঁছবে বলে মনে হয় না। আর আপনার কোনো দুঃসংবাদ? আপনার নিন্দা-মন্দ? আপনার কোনো স্ক্যান্ডাল? ও বাতাসের আগে ছুটবে। আপনার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব তো বটেই, যাকে আপনি কোনোদিনও দেখেন নি, তিনি পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে জেনে যাবেন। শুধু জেনে যে যাবেন, তা নয়, খবরটার ব্যাপারে আরো অনুসন্ধান করার দায়িত্ব নিজে নিয়ে নেবেন। রাগ করছেন কেন? আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই নেবেন। এসে পারলে আপনার কর্মস্থলে আপনার অভিভাবকদের কাছে দুটো সদুপদেশ দিতে কার্পণ্য করবেন না। আপনার ভালোর জন্যে। সমাজের ভালোর জন্যে। যেন সমাজটাকে ভালো রাখার দায়িত্ব তাদের।

আমার বেলায় এসব শুরু হয়ে গেল। আমারই কোনো ক্লাসমেট হবে, বাসায় ফোন করে জানিয়ে দিল যে আমি ঠিকভাবে ক্লাস করছি না। কথায় সত্যতা আছে, আপনারা জানেন। ক্লাসের নাম করে আমি বেরিয়ে যাই, কিন্তু ক্লাসে যাই না। তাহলে আমি যাই কোথা? এটা নিশ্চয় গুরুতর অভিযোগ। আব্বা আর মা'র ব্রহ্মতালু গরম করার জন্যে এই ফোনই যথেষ্ট। মা আমাকে জেরা করতে লাগলেন, হৃদি, কাল তুমি বাসায় এসেছ বিকাল চারটায়। আর ক্লাস থেকে বের হয়েছ সকাল ৯টায়। বাকি সময় তুমি কোথায় ছিলে?

'বেড়াতে গিয়েছিলাম। বুড়িগঙ্গা দেখতে।'

'কার সঙ্গে?'

'কার সঙ্গে নয়। কাদের সঙ্গে? বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন হচ্ছে। আমরা একটা ফটো এলবাম বের করতে যাচ্ছি। সবাই মিলে ফটো তুলতে গিয়েছিলাম।' (মিথ্যা কথা। ভালোই তো মারলাম ইনস্ট্যান্ট চাপা)

'সাথে কে কে ছিল।'

'এই ছিল আর কী? কেন তুমি এত জানতে চাচ্ছ কেন?'

'স্মৃতি ছিল।'

'না।' (বুঝলাম, স্মৃতি হতে পারে এই কালপ্রিট। যাকে লাগিয়েছে।)

ক্লাস করা না করার অভিযোগ তবু সামলানো যায়। কিন্তু একটা লোক গাড়িতে হৃদিতাকে মাঝে মধ্যে তুলে নিয়ে যায়, মাঝে মধ্যে রেখে যায়, এই ব্যাপারটা মারাত্মক।

আব্বার কাছে ফোন এল। কে কী বলেছে, আব্বা জানেন। কিন্তু সেটা যে ভালো কিছু নয়, সেটা বোঝা গেল মা'র তদন্তে।

মা খোঁজ করতে লাগলেন, আমি যে সোনার চেইনটা পরছি, এটা এল কোথা থেকে।

আমি তেতে উঠলাম। 'কোত্থেকে আবার. সেবার বড়পা রিয়াদ থেকে নিয়ে এল না?'

'এই জামা তো খুব দামি জামা। পেলি কই?'

'আমি তো বাবা ইউনিভার্সিটি থেকে স্টাইপেন্ড পাই নাকি। আমার টাকা থাকবে না তো কি তোমার থাকবে। এসব প্রশ্নের মানে কী? আমি জানতে চাই এসব প্রশ্নের মানে কী?'

তারপর কান্নাকাটি, রাগারাগি, ভাত খাওয়া বন্ধ। মা বলে দিয়েছেন, 'কোথায় যাস, কার সাথে যাস, বলে যেতে হবে। দরকার হলে মন্টিকে সাথে নিবি।'

আমিও স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছি। দেখো মা, 'আমার বয়স আঠারো পার হয়ে গেছে, আমাকে তোমরা এরকম কথা বলতে পারো না। আমি যা ভালো মনে করি, করব। তবে নিশ্চয় এমন কিছু করি না, যাতে তোমাদের মাথা নিচু হয়ে যায়।'

মা বললেন, 'মাথা নিচু হবার আর কিছু বাকি নাই।'

আমি বললাম, 'মাথা উঁচু করো। মাথা নিচু থাকলে স্পাইনাল কর্ডে ব্যথা হয়ে যাবে।'

এক সন্ধ্যায় আব্বা মন্টিকে মারলেন। আব্বা তার ছেলেমেয়ের গায়ে নিজে হাত তোলেন না। অন্য কেউ তাদের মারতে পারবে না, এটাই তার নির্দেশ। বোঝা যাচ্ছে, আবহাওয়া ভালো নয়। সমুদ্রে নিম্নচাপ। বাতাস জোরে বইছে। বড় ধরনের দুর্যোগ দেখা দিতে পারে।

আসলে আব্বা মন্টিকে মেরেছেন আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে।

বাসায় সেদিন ফিরেছি সন্ধ্যার পরে। এসে দেখি, আব্বাও গম্ভীর, আম্মাও গম্ভীর। ফতের রিপোর্ট, মন্টি আর আমি– আমাদের দুজনের কাউকে না দেখে আব্বা আম্মার সাথে চেঁচামেচি রাগারাগি করেছিলেন। আম্মা তাকে বলে দিয়েছেন, তোমার ছেলেমেয়ে তুমি সামলাও।

এরপর প্রথমে আমার প্রবেশ।

আমি ও-ঘরে গিয়ে কাপড়চোপড় পাল্টে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। ডাইনিং টেবিলে বসে বললাম, ফতে, এক কাপ চা দে।

ওদিকে ড্রয়িং রুমে দুজন গাল ফুলিয়ে বসে আছেন।

এমন সময় দরজায় বেজে উঠল ডোরবেল। ফতে গিয়ে দরজা খুলে দিল। মন্টির প্রবেশ।

আব্বা চিৎকার করে উঠলেন, 'কে এলো! কোন গর্দভ! এই কে, এদিকে আয়!'

মন্টি ভয়ে ভয়ে আব্বার কাছে গেল।

'এই হতভাগা! কই গিয়েছিলি!' আব্বার চিৎকার। যে লোক সাধারণত রাগেন না, তাকে রাগারাগি করতে দেখলে কেমন ভয়াবহ ব্যাপার হয়!

মন্টি কোনো কথা বলছে না।

'পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে?' আব্বার জেরা।

'জি আব্বা।'

'জি আব্বা! বলতো দশমিক ১ গুণন দশমিক ১ কতো হয়?

মন্টি কোনো কথা বলে না।

আব্বা হুংকার ছাড়েন, 'বল! এক চড়ে ৩২টা দাঁত ফেলে দেব! কান টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব। ক্লাব করা হচ্ছে, না? যাহ। ভাগ চোখের সামনে থেকে!'

মন্টি বলল, 'দশমিক ১ হয়।'

তিনি মন্টির গালে মারলেন এক চড়। মন্টি ভ্যাঁ করে কেঁদে দিল।

আব্বা গজগজ করতে লাগলেন, বেয়াদব হয়ে উঠছে একেকটা। মান-সম্মান কোনো কিছু রাখল না। সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফেরে? কত বড় সাহস।

স্পষ্টতই এটা আমার ওপরে আঘাত। আমি কী করব? নিজের ঘরে এসে চুপচাপ ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকা ছাড়া আমি আর কীইবা করতে পারি।

ও ঘর থেকে মন্টির কান্না আসছে।

কান্না সংক্রামক।

আমিও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। আমার কাঁদার একশ একটা কারণ আছে। যে কোনো একটা কারণ মনে করলেই চলে। আপাতত আমি কাঁদছি নিজের অসহায়ত্বের জন্যে।

কবিরদের বাসায় গেছি। কবির বাসায় নেই। খালাম্মা গেট খুললেন। বললেন, 'ওতো মা একটু ডাক্তারের কাছে গেছে। জানোই তো ডাক্তারের কাছে গেলে দেরি হয়। কখন যেতে হবে, এ টাইমটা তুমি জানো, কিন্তু উনি কখন তোমাকে দেখবেন, কখন তুমি ফিরবে, সেটা তুমি জানো না।'

বাবা, খালাম্মা তো খুব ভালো কথা বলতে জানেন।

'আসো, ভেতরে আসো, অনেক দিন তোমার সাথে গল্প করা হয় না। কথা বলতে তো খুব ইচ্ছা করে, লোক পাব কোথায়।'

আমরা গিয়ে বসবার ঘরে বসলাম।

বললাম, 'আপনার শরীর কেমন?'

'ভালো মা। আমার শরীরে আল্লায় দিলে কোনো অসুখ-বিসুখ নাই। তুমি ভালো আছ?'

'আছি খালাম্মা।'

'তোমার আব্বা-আম্মা?'

'জি আছেন।'

'একদিন তোমার আম্মাকে নিয়ে আসো। আলাপ-পরিচয় করি।'

'জি, আনব। আপনাকেও নিয়ে যাব।'

'সারাদিন একা একা থাকি। তোমার খালু মারা গেছেন এত বছর হলো। তারপর বড় ছেলেটা মারা গেল বিদেশ বিভুঁইয়ে। একা থাকতে আর ভালো লাগে না। তুমি তো আমার মেয়ের মতো। তোমাকে বলা যায়– ছেলেটার একটা বিয়ে দিতে চাই। যে কয়দিন বাঁচে, বউয়ের সঙ্গে একটু আনন্দে-আহ্লাদে সময় কাটাক। তুমি কী বলো মা!'

'হ্যাঁ। ঠিকই তো! বিয়ে দিতে পারলে তো ভালোই!'

'মা বলছিলাম কী, তোমার হাতে কি এমন কোনো মেয়ে আছে, যে আমার ছেলেটাকে ভালোবাসবে, আবার সব জেনেশুনে বিয়েতে রাজি হবে!'

'দেখি! একটু চিন্তাভাবনা করে তারপর বলি!'

'আচ্ছা মা। তুমি মা একটু কবিরকেও বোঝাবে! এখন একটু সেন্টিমেন্টাল থাকে তো! ওকে কোনো কিছু বলতেও পারি না। রেগেটেগে যায়। আবার ওর রাগারাগি করাটাও নিষেধ। বলো তো ওকে।'

'আচ্ছা বলব।'

'বললে ও কী বলে আমাকে জানাবে।'

'জি আচ্ছা।'

'আমি তোমাকে অন্তর থেকে দোয়া করি মা। আল্লাহ্ তোমার ভালো করবেন।'

খালাম্মার ওখান থেকে ফেরার পর থেকে তার কথাগুলো সারাক্ষণ মাথার ভেতরে বাজছে। আহারে মহিলা। স্বামী মারা গেছে, আরেক ছেলে ছিল, সেও মারা গেছে। এত বড় বাড়ি নিয়ে ধানমণ্ডির মতো এলাকায় সুখের সংসার ছিল। কী থাকল আজ? যে ছেলে বেঁচে আছে, সেও মারা যাবে। শূন্য বাড়িতে থাকবেন বৃদ্ধা একা। না, টাকাপয়সা বড় কথা নয়। সে ব্যবস্থা নিশ্চয় করা আছে। কিন্তু কী হবে তার শেষ দিনগুলোতে।

পৃথিবীর সমান একাকীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

সেদিন নৌকায় ফেরার সময় কবির লালনের গান গাইছিল। পারে লয়ে যাও আমায়। আমি অপার হয়ে বসে আছি, ওহে দয়াময়।

অপার হওয়া কাকে বলে।

আমার চোখ জলে ভিজে আসে।



কবিরের কথা

আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকি। লেপের নিচের ওমটুকু আরাম লাগছে। সকাল ১০টা বাজে। রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়েছি। ডাক্তার দিয়েছেন।

ডাক্তার বলেছেন, আপাতত ভালোই আছি। কোনো চিন্তা নাই। কিন্তু হৃৎপিণ্ডে রোগ রয়ে গেছে। দিন দিন বাড়ছে। এ হারে বাড়লে...

না। এসব চিন্তা করতে চাই না। যতদিন বেঁচে আছি পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হবে। এ পৃথিবীর সবাই একদিন মারা যাবে। এমনকি আমি যে ভাবছি ছয় মাস কি এক বছর বাঁচব, তারই কি নিশ্চয়তা আছে। কালকে একটা আজব পরিসংখ্যান দেখলাম। মার্কিনিরা পরিসংখ্যান-প্রিয় জাতি। নানা বিষয়ে তাদের উপাত্ত আছে। কালকে দেখলাম, প্রতি বছর সাড়ে তিনশ আমেরিকান মারা যায় বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে। তাহলে? এই ঘরে বসে, বিদ্যুতের তার ছুঁয়ে, আগুনে, বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে, বাথটাবে উপুড় হয়ে পড়ে, মাথার ওপর ফ্যান খুলে পড়ে...কতভাবে আমি মারা যেতে পারি। ছিনতাইকারীর ছুরি, এডিস মশার হুল, ম্যানহোল কত কি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। যে কেউ যে কোনো মুহূর্তে মরতে পারে। তাই বলে মৃত্যুভয়ে জীবন থেমে থাকবে নাকি। ভাত চিবিয়ে খেতে হবে, ইচ্ছা হলে ডালে লেবু চিপে নিয়ে প্লেট তুলে ঢকঢক করে পিয়া যাব, এই তো জীবন। জয়তু জয়শ্রী জীবন। শুয়ে থাকতে ইচ্ছা হলে শুয়ে থাকব, ইচ্ছা না হলে কলাবাগান মাঠে গিয়ে ছেলেদের ক্রিকেট খেলা দেখব।

দরজায় ঠকঠক শব্দ। মা'র গলা– কবির, কবির।

'এসো।'

'বাবা! আজ যে এতো বেলা পর্যন্ত শুয়ে আছিস। শরীরটা খারাপ লাগছে নাকি!'

'শরীর! আর শরীর দিয়ে কী হবে মা!'

'কী বলিস। শরীরই তো আসল। শোন, আবার কবে যাবি ব্যাঙ্কক!'

'আর যাবো না!'

'ট্রিটমেন্ট করাতে হবে না।'

'কী হবে!'

'এভাবে বলছিস কেন রে! আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ। হায়াত-মউত সব তাঁর ওপর না! নে দেখি, উঠতে পারিস কিনা!'

'পারব! তুমি আমার পাশে বসো। আরেকটু শুয়ে থাকি!'

'কবির। একটা কথা বলব! কিছু মনে করিস না। আবার হেসেও উড়িয়ে দিস না! বলব?'

'বলো।'

'হৃদিতা মেয়েটা তো খুব লক্ষ্মী! তোকে পছন্দও করে খুব! ওকে তুই বিয়ের কথা বল।'

আমি হাসলাম।

'হাসলি যে বড়ো!'

'হাসির কথা বললে বলেই হাসলাম।'

'আল্লার ইচ্ছায় তুই একশ বছর বাঁচবি! ওটা আমি ভাবি না! নিজেকে নিয়েও ভাবি না। তবু এতো বড়ো বাসা! আমি একা একা থাকি! বউমা থাকলে, একটা বাচ্চা-কাচ্চা হলে কতো গমগম করবে বাড়িটা! আমি বুড়ি মানুষ, বাচ্চাটাকে নিয়ে পড়ে থাকতাম!'

'মা। আমি তোমার কথা ভেবে কোনো কূল পাই না! আমার যদি সত্যি সত্যি একটা কিছু হয়ে যায়... তুমি মামাদের ওখানে গিয়ে উঠবে!'

'যা বলি, তাই কর। একটা বিয়েশাদি কর! হৃদিতা মেয়েটা ভালো। বলে দ্যাখ। নিজে থেকে যদি রাজি হয়... আমরা তো আর জোর করছি না।'

'ওর নিজেরও শরীর ভালো না মা। আমার মতোই ওরও কোনো গ্যারান্টি নাই।'

'কী বলিস?'

'হ্যাঁ। ঠিক বলছি। সে-কারণেই ওর সাথে আমার এত মিল। ও আমার দুঃখ বোঝে, আমিও ওরটা। কী তুমি মন খারাপ করছ কেন? ভেবো না সারাক্ষণ আমরা এসব নিয়েই কথা বলি। আমরা স্বাভাবিক মানুষের মতোই আছি। হাসিখুশি। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।'

'তাহলে তো বিয়ের প্রস্তাবটা দেওয়াই যায়।'

'দেখি। ভেবে দেখি।'

আমার আশ্বাসে মা কিছুটা খুশি হলেন বলেই মনে হলো। আমিও বিছানা ছেড়ে উঠলাম। আর কত।

দুদিন পরে শরীরটা ফের ভালো লাগতে শুরু করলে মন বলল, পিকনিকে যেতে হবে। শীতকাল। এখানে-ওখানে পিকনিকের গাড়ি দেখা যাচ্ছে। আমাদের বাসার সামনে থেকে স্কুলের ছেলেমেয়েরা গাড়িতে ব্যানার ঝুলিয়ে মাইক বাজিয়ে চলল পিকনিকে।

ফোনে বললাম হৃদিতাকে। 'চলো, পিকনিক করে আসি।'

হৃদিতা বলল, 'কই যাবে?'

'তুমি বলো।'

'দূরে কোথাও তো আর যাওয়া হবে না। এক কাজ করা যায়। চিড়িয়াখানা বা ধরো বোটানিকাল গার্ডেনে যাওয়া যায়। সাথে মহিলা বলাইকে নিয়ে নিলে তোমাকে সব গাছ চিনিয়ে দেবে।'

'সে আবার কে?'

'আছে একজন। তবে একটা সমস্যা আছে।'

'কী?'

'বাইরে গেলে মন্টিকে সাথে নিতে হবে। বাসার অর্ডার।'

'নেব। অসুবিধা কী?'

'কোনো অসুবিধা নাই।'

'তাহলে চলো। এক কাজ করি। খালাম্মাকেও সাথে নেই। একা একা সারাক্ষণ বাসায় থাকেন।'

'দেখি বলে। যায় নাকি।'

শেষে চিড়িয়াখানা যাওয়াই স্থির হলো। মাও রাজি হলেন। তিনি প্রধান অতিথি। মন্টি হলো আমাদের বিশেষ অতিথি। সকালবেলা মন্টি আর হৃদিতা এল রিকশায়। কারণ তাদের বাসার সামনে আমার গাড়ি যাওয়া নিষেধ। পাড়ার মুরুব্বিদের অসুবিধা হয়।

মা অনেক কিছু নিয়েছেন রেঁধে বেঁধে। কাজেই হৃদিতার কিছু করার ছিল না। যদিও হৃদিতা বিস্কুট-টিস্কুট নিয়েছে। মন্টির সঙ্গে এটা আমার প্রথম সাক্ষাৎ। এর আগে তার কথা অনেক শুনেছি। আজ সে মাথায় একটা হেডফোনের ব্যান্ড লাগিয়ে এসেছে। পকেটে তার ওয়াকম্যান।

আমি বললাম, 'মন্টি, কী করো, গান শোনো।'

সে কান থেকে যন্ত্র বের করে বলল, 'কিছু বলছেন?'

'গান শোনো?'

'শুনছিলাম।'

'তোমার প্রিয় গায়ক কে?'

'হাসান।'

'উনি আবার কে?'

'আর্কের হাসান।'

হৃদিতা হাসতে হাসতে বাঁচে না। বলে, 'বুড়োবাবা, এ হলো নিউ জেনারেশন'স চয়েস। তোমাকে একদিন ওপেন এয়ার কনসার্টে নিয়ে যাব। দেখবে কী আনন্দই না করে ছেলেমেয়েরা।'

মন্টি বলল, 'শুনবেন?
'হাসানের গান?
'হুঁ।'
'দাও তো শুনে দেখি।'
কানে ফোন লাগালাম। গান চলল। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝলাম না। যেন এক দেশের বুলি আরেক দেশের গালি। ঠিকই আছে। চীনারা যখন গান গায়, আমাদের কাছে কি সুরটাও অদ্ভুত লাগে না।
মা তার বিশাল ব্যাগ ধরিয়ে দিলেন জয়নালকে। গাড়িতে ব্যাগ উঠছে।
আজ বেশ শীত পড়েছে। সবার গায়ে শীতের কাপড়। আমি একটা জ্যাকেট গায়ে চড়িয়েছি। পরনে জিন্‌স। পায়ে কেড্‌স। হৃদিতা পরেছে সেলোয়ার-কামিজ। তারওপর সোয়েটার। তারওপর চাদর। মা-ও গার্ডিগান, চাদর। মন্টির গায়ে জ্যাকেট, সেটার আবার টুপি আছে, এখন টুপিটা ঘাড়ের পেছনে ঝুলছে।
সবাই গিয়ে উঠলাম গাড়িতে। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে আমি, পেছনের সিটে মা, মন্টি আর হৃদিতা।
মন্টিকে বললাম, 'দাও দেখি তোমার হাসানের ক্যাসেটটা। সবাই মিলে শুনি।'
মন্টি ক্যাসেটটা ওয়াকম্যান থেকে বের করে দিল। গাড়ির ক্যাসেটে সেটা ঢুকিয়ে দিলাম। গান হচ্ছে, যারে যারে উড়ে যারে পাখিটারে বলে যারে সে যেন ভোলে না রে...
মন্টি বলল, 'জোশ গান না?'
স্বীকার করতেই হলো।
সে বলল, 'আমাদের ক্লাসের হিশাম একবার হাসানের সাথে হ্যান্ডশেক করেছিল, এরপর সাতদিন হাত ধোয়নি, গোসল করার সময়ও ডানহাতে পানি লাগায় নি।'
আমি বললাম, 'কেন?'
মন্টি বলল, 'আ রে ডানহাতে হাসানের টাচ লেগে আছে না।'
বললাম, 'ভাতও খায়নি।'
মন্টি বলল, 'খেয়েছে। চামচ দিয়ে।'
পৃথিবীতে কত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, আমি কিছুই জানি না। নাহ্ সত্যি এবার একটা ওপেন এয়ার কনসার্টে যেতেই হবে।
চিড়িয়াখানায় যেতে যেতেই রোদ উঠে গেল। আমরা ঘুরে ঘুরে নানা খাঁচায় নানা পশুপাখি দেখতে লাগলাম। জলহস্তি জিনিসটা আগে ছিল না। সম্প্রতি এসেছে। চিড়িয়াখানার লোকজন লালশাক এনেছে। আর সব জলহস্তি উঠে এসে ইয়া বড় হা করছে।
বাঁদরের খাঁচার কাছে গেলাম।

হৃদিতা বলল, 'মন্টি, মন্টি, ওই যে তোর বন্ধুরা তোকে ডাকছে। বলছে, এই মন্টি, তুই খাঁচার বাইরে কেমন করে গেলি রে। এই মন্টি, তোর লেজটা কোথায় গেলো রে!'
মন্টি বলল, 'ইস! ওরা তোমার বন্ধু। বহুদিন পর তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছে।'
আমি বললাম, 'ভাইয়ের বন্ধু যদি বাঁদর হয়, বোনের বন্ধুও বাঁদরই হবে! এ নিয়ে আর ভাইবোনে ঝগড়াঝাঁটি কেন!'
হৃদিতা বলল, 'অ! আর আমগো লগে তুমি যে আইছ, তোমার লেঙ্গুরটা কই! হেইডা আর লুকাইও না! হি হি হি!'
মা সবচেয়ে চিন্তিত গরিলা দেখে। বললেন, 'দেখ দেখ, একেবারে মানুষের মতো ভাবভঙ্গি। শুধু কথা বলতে পারে না। মায়া লাগছে রে। আমাদের চেয়ে ওরা যদি বেশি বুদ্ধিমান হতো, তাহলে আমাদেরকেই এভাবে আটকে রাখত, আর ওরা আমাদের দেখে হাততালি দিত।'
কঠিন কথা বলে ফেললে মা। ডারউইন সাহেবের কথা। স্ট্রাগল ফর এক্সিসটেন্‌স এন্ড সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট।
শরীরটা বেশি ভালো লাগছে না। কিন্তু এদের এটা বলা যাবে না। মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে।
মানুষ যে শুধু অস্তিত্বের সংগ্রামে রত আর অন্যকে হারিয়ে দিয়ে নিজে টিকে আছে তাই নয়, সে অন্যের জন্যে স্বার্থত্যাগও করে এবং অন্যের জন্য নিজের জীবন বিসর্জনও দিতে পারে।
আমরা একটা গাছের নিচে বসলাম চাদর পেতে। কোল্ড ড্রিংকস আর চিপ্‌স নিয়ে টোকাইরা আমাদের পেছন পেছন ঘুরছে। তাদের কাছ থেকে ড্রিংকস কিনলাম। তারপর মা তার ব্যাগ থেকে খাবার বের করে দিলেন আমাদের। বসে বসে এক সাথে খাচ্ছি, এমন সময় হৃদিতাদের বিল্ডিংয়ের এক পরিবারের সাথে আমাদের দেখা হয়ে গেল।
তারা মন্টিকে ডেকে নিল।
বলল, 'কী খবর তোমরা এখানে, আবার ওই গাড়িঅলা ভদ্রলোককেও দেখছি। কী রে মন্টি তোদের আপার বিয়ে হয়ে গেছে, তোরা আমাদের দাওয়াত দিস নি? দুলাভাইয়ের সাথে মজা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস।'
ওরা চলে গেলে হৃদিতা বলল, 'দেখলে, কী বলল। আজ বাসায় গিয়ে কী লাগানোটাই না লাগাবে।'
মা বললেন, 'মন খারাপ কোরো না মা। আমরা দুই ফ্যামিলি এক সাথে বেড়াতে আসতে পারি না?'
হৃদিতা বলল, 'আপনি জানেন না খালাম্মা, ওরা কত খারাপ।'
ওরা যে খারাপ, সেটা হৃদিতা বুঝল ভালো করে, দু-একদিনের মধ্যেই।



হৃদিতার কথা

আব্বা আমাদের সাথে সাধারণত গলা তুলে কথা বলেন না। আমরা তার কাছে বকুনি খেতে অভ্যস্ত নই। সেদিন আব্বা মেরেছিলেন মন্টিকে। পরে তিনিই আবার মন্টিকে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি খাইয়ে আনিয়েছেন। একদিন গলির মুখে ঢোকার সময় তিনি দেখলেন একটা ভ্যান গাড়ি, তাতে লেখা ডেঙ্গু প্রতিরোধ ক্লাব। এই গাড়ি রোজ দুপুরবেলা পাড়ার প্রতিটা বাড়ির সামনে দাঁড়ায়, বাঁশি বাজায়, আর প্রতি বাড়ি থেকে ময়লার ব্যাগ নিয়ে লোকেরা নেমে সরাসরি গাড়িতে ময়লা ফেলে আসে। এর ফলে আর গলিতে, বাড়ির সামনে ময়লা জমে না। এটা অন্য অনেক পাড়ায় চালু আছে, কলাবাগানেরও অন্য লেনে ছিল, এই লেনে ছিল না।

তিনি বাসায় এলেন। মন্টিকে ডাকলেন। বললেন, 'মন্টি, নিচে যে ময়লার ভ্যান দেখলাম, এটা কি তোদের কাজ?'

মন্টি ভয়ে ভয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'ভেরি গুড। ভেরি গুড। তাই তো বলি রাস্তায় আর ময়লা-আবর্জনা জমে না কেন? এটা তোরা করলি কীভাবে?'

'মানে?'

'টাকা পেলি কোথায়?'

'অনেক বাসায় বড়রা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। চৌধুরী চাচার কাছে চাঁদা চাইতে গেলে তিনি বললেন, টাকা দেব না। কোনো জিনিস চাও। আমরা অনেক ভেবে তার কাছে রিকশাভ্যান কিনে চাইলাম। দিল।'

'গুড। আমার কাছে চাঁদা চাস নাই কেন?'

এরপর তিনি মন্টিকে বিক্রমপুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে দোকানের স্পেশাল দুধ মালাই খাইয়েছেন।

সেই আব্বা আজ আমার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করলেন।

আমি জানি, আব্বাকে কে লাগিয়েছে। চিড়িয়াখানায় যে দেখা হলো জিনিয়াদের সাথে, জিনিয়াদের বাসা থেকেই হয় আব্বাকে ফোন করেছে, অথবা বাসায় এসে মাকে শুনিয়ে গেছে দু'কথা।

বেশি কথা তো বলার দরকার নেই, বললেই হবে যে আপনার মেয়ে আর জামাই আর মন্টিকে দেখলাম শাশুড়ির সাথে। জামাই ভালোই। তবে বয়সটা একটু বেশি। আর কিছু লাগবে না।

আমি ফিরছিলাম ক্যাম্পাস থেকেই। আমাদের ডিপার্টমেন্টের একটা ডিবেট ছিল টিএসসিতে। শিক্ষক-ছাত্র বিতর্ক। মজার হবে ভেবে আমি গেলাম দেখতে। সত্যি কথা বলতে কী, মজা হয়েও ছিল। অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নওরোজকে বললাম, 'নওরোজ, একটু বাসায় পৌঁছে দিবি।'

সে বলল, 'চল। শালা আজকে আব্বার স্টেশন ওয়াগনটা এনেছি নিজে ড্রাইভ করে। কাউকে দেখাব যে চান্সই পেলাম না। এভরিবডি হ্যাজ বিকাম ক্রেজি উইথ দিস সো-কলড ডিবেট। আরে বাবা ঝগড়া করবি কর, তার জন্যে আবার অনুষ্ঠান করা লাগে নাকি। সব পুতু পুতু ব্যাপার।'

নওরোজের স্টেশন ওয়াগন আমাকে নামিয়ে দিল আমাদের বাসার সামনে। বললাম, 'থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আয় বাসায়। পুডিং বানানো আছে।'

বলল, 'ড্রাইভার নাই। গাড়ি পাহারা দেবে কে? তুই দিবি?'

'না।'

'যদি গাড়ি চুরি হয়?'

'হতেই পারে। এর আগে একজন লিফট দিয়ে ধরা খেয়েছেন। পার্টস আমার চোখের সামনে খুলে নিয়ে দিল এক দৌড়।'

'বাদ দে। বরং তোর পুডিং ক্লাসে নিয়ে আসিস। বাব্বাই।'

সুন্দর করে বাই বাই বলে আমি কেবল বাসায় পা রেখেছি, আব্বা বললেন, 'হৃদিতা, দাঁড়াও।'

দাঁড়ালাম।

'তুমি কোথায় যাও, না যাও, আর কথা শুনতে হয় আমাদের। এটা চলবে না। এটা বাংলাদেশ। ইউরোপ আমেরিকা না!'

'আব্বা আমি ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম।'

'ইউনিভার্সিটি? ইউনিভার্সিটি কি রাতের বেলা খোলা থাকে নাকি?'

'অনুষ্ঠান ছিল।'

'অনুষ্ঠান? অনুষ্ঠানের জন্যে তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে পাঠানো হয়েছে না? তোমার পড়াশুনা বন্ধ। বাইরে যাওয়া বন্ধ। মন্টির মা আজ থেকে এই মেয়ে যেন বাইরে না যায়! দরজায় তালা দিয়ে রাখবে!'

মা বললেন, 'আমার কথা কে শোনে! তোমার মেয়ে তুমি ভালো করে বলো।'

বাবা বললেন, 'শুনছো! আজ থেকে তোমার বাইরে যাওয়া বন্ধ। আর ফোন আমি আজকে খুলে রেখে দেবো! ছিঃ ছিঃ ছিঃ। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসছে!'

মা বললেন, 'চুপ করে আছিস কেন? বল কথা, ভুল হয়ে গেছে। আর এসব করব না। বল! বল!'

আমার খুব রাগ হতে লাগল। যে দোষ আমি করেছি, তার শাস্তি আমি নিতে রাজি আছি। কিন্তু যেটা আমি করিনি, তার দোষ কেন আমাকে দেওয়া হচ্ছে। আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আমি বললাম, 'আব্বা! আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি তার সংশোধন করতে চাই। আমি ঠিক করেছি, ওনাকে আমি বিয়ে করবো। শুনেছো, আমি ঠিক করেছি, ওনাকে বিয়ে করবো!'

'কাকে?'

'কবিরুল ইসলামকে।'

'ওই আর্টিস্টকে। তুমি জানো ওর একটা অসুখ আছে। ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, উনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না।'

'ও। তোমরা সে খবরও নিয়ে ফেলেছ। তাহলে তো ভালোই। এখন জেনে রাখো আমি, ওনাকেই বিয়ে করব এবং সেটা এক্ষুনি। ব্যস। এটাই আমার ফাইনাল কথা। তার আগে আমি আর দানাপানি ছুঁচ্ছি না।'

আব্বা বললেন, 'এত আদর করে এত কষ্ট করে মেয়েকে মানুষ করে এই তার প্রতিদান। ঠিক আছে, আমিও দানাপানি ছোঁব না।' আব্বা হনহন করে গিয়ে তার বেডরুমের দরজা বন্ধ করলেন।

আমিও সোজা ঘরে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। একটু ভুল হয়ে গেল। ফোনটা তো আবার ডাইনিং স্পেসে। ওকে যে ফোন করে একটা কিছু পরামর্শ করবো, তার উপায় রইল না।

প্রথমে মাথাটা আভিধানিক অর্থেই গরম হয়ে রইল। কান দিয়ে ভাপ বেরুতে লাগল। বিছানায় বসে থাকলাম হপ্ হয়ে। তারপর কানের গরমটা কমলে গেলাম বাথরুমে। মাথায় পানি ঢাললাম। শীতকাল। অল্প পানিতেই কাজ হলো। বিছানায় ফিরে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগলাম মনের সুখে।

আসলে আব্বার কাছ থেকে কোনোদিন একটা গলা-চড়ানো ধমক বা বকুনি খাই নি। তিনি অল্প বকলেই বুকে এসে বেঁধে শেলের মতো। সমস্ত রাগ আব্বার ওপরেই গিয়ে পড়ল, যদিও জানি, সম্পূর্ণ অকারণে।

আব্বা সত্যিই অনেক কষ্ট করেই সংসার চালাচ্ছেন। সরকারি চাকরি করেন, হিসাবের পয়সা, এই আয়ে সংসার চলতে চায় না। গ্রামে কিছু জমিজমা আছে, বছরে দুবার গিয়ে ধান বিক্রি করেন, পাট বা সরষে বা আঁখ বিক্রি করা টাকা বর্গাচাষীদের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় নিয়ে আসেন। মাঝে মধ্যে তাতেও যখন কুলায় না, জমি বিক্রি করেন। কিন্তু আমাদের তিনি কখনও অভাবটা বুঝতে দেননি। আমরা যখন যা করার করছি, যখন যা চাই, পাচ্ছি। আমার অনেক বন্ধু টিউশনি করে, আমাকে তা করতে হয়নি। আমার স্টাইপেন্ডের টাকাটাও আমার কাছেই থাকে, জন্মদিন ইত্যাদিতে বন্ধু-বান্ধবদের উপহার-টুপহার দেওয়া যায়।

সেই আব্বা আমাকে আজ বকা দিচ্ছেন। হুহু করে কান্না আসতে লাগল। আব্বা

কেন বুঝবেন না আমার দিকটা। ভালোবাসা কি আর হিসেব করে হয়? কত এমন হয় না, বড় ধুমধাম করে বিয়ে হলো, ৭ দিনের মাথায় বর গেল মরে? মানুষ কি গণকের কাছে বরের আয়ু জেনে নিয়ে বিয়ে করে নাকি? হায়াত-মউত-রিজক-দৌলত-বিয়ে এসব কি আল্লার ইচ্ছা না?

এমনও তো হতে পারে, ডাক্তাররা ভুল বলেছে। আসলে সে বাঁচবে, বহুদিন?

দশটা বাজল। টেলিভিশনে সবকটা জানালা খুলে দাও না মিউজিক বাজছে।

'হুদি, হুদি, দরজা খোল, আয় ভাত খা।' মা দরজা ধাক্কাচ্ছেন। বার বার। মাকে অন্তত জানানো দরকার যে, আমি ঠিক আছি। না হলে আবার, আমার মা তো, পুলিশ-টুলিশ নিয়ে এসে একাকার করবেন।

বললাম, 'আমার খিদা নাই। তোমরা খাও।'

'তোমরা খাও বললেই হয়ে গেল। ওদিকে উনি খাবেন না, এদিকে ইনি খাবেন না। কী মুশকিল। সব যন্ত্রণা হয়েছে আমার। খোল দরজা।'

আমি নীরবতা বজায় রাখলাম।

মা আবার ওই ঘরে গেলেন। 'আচ্ছা কেমন মানুষ তুমি, তুমি কেন দরজা বন্ধ করবে। আরে আশ্চর্য তো। আমি কিন্তু যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। খেতে আসো।'

রাতটা কাটিয়ে দেওয়া গেল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। চুপচাপ জেগে রইলাম।

সকালবেলা মা আবার দরজা ধাক্কাতে লাগলেন।

'ওঠ। কত আর তোরা হাড় জ্বালাবি? তুই না হয় ছেলেমানুষ। না খেয়ে থাকতে পারিস। তোর আব্বার ডায়াবেটিস। সে কি না খেয়ে থাকতে পারে। ওঠ। খোল দরজা। আব্বাকে খেতে ডাক।'

খুবই দুর্বল জায়গায় আঘাত।

আমি কী করব?

ঠিক আছে। আব্বাকে ডেকে খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় নিয়ে যাব। তারপর সোজা কাজির বাড়ি। যা হবার হবে।

মন্টি এসে দরজায় কাঁদতে লাগল। 'আপা, আপা, তোমরা এ রকম কোরো না। আমার খুব খারাপ লাগছে।'

ঠিক আছে। আমি বেরিয়ে এলাম। আব্বার ঘরের দরজায় গেলাম। আব্বা, আব্বা, আসেন, বের হয়ে আসেন। আপনি কী বলেন, শুনি। আসেন। আব্বা। আমি কাঁদতে লাগলাম। মন্টি কাঁদতে কাঁদতে আব্বাকে ডাকতে লাগল। মা বললেন, হ্যাঁ গো এবার বের হও।

আব্বা দরজা খুললেন। তার চোখ-মুখ ভারি। মনে হয়, তিনিও কেঁদেছেন। তিনি বেরুতেই তাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। তিনি আমার মাথার চুলে আঙুল বিলিয়ে দিতে লাগলেন।

'আয়, আগে খাই।'

আমরা সবাই টেবিলে বসলাম। মা বললেন, 'ফতে, এই ফতে, পরাটাগুলো ভাজ তাড়াতাড়ি।'

আব্বা বললেন, 'ভাজতে হবে না। এগুলো দিয়েই শুরু করি।'

মা বললেন, 'ঠাণ্ডা তো।'

আমরা নাশতা সারলাম। চা খেলাম।

আব্বা বললেন, 'হৃদি শোন, হৃদির মা তুমিও শোনো, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, হৃদি যে ছেলেটাকে পছন্দ করেছে, আমাদের তাকে মেনে নেওয়াই উচিত। ওরা যদি বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়, আমরা তাতে রাজি হব। হওয়া উচিত। আমার মায়ের কথা ভাবি। বাবাও তো বিয়ের দু'বছরের মাথাতেই মারা যান। বিয়ের আগেই তার টিবি ছিল। মা জানতেন। বাবা ছিলেন মা'র লজিং টিচার। মা তাকে বিয়ে করবেনই। নানা-নানি কী আর করেন, রাজি হলেন। বিয়ের পরে বাবা মারা গেলেন। মা'র খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তিনি তার ভায়ের কাছে, বাবার কাছে এক পয়সা সাহায্য নেননি। অনেক কষ্ট করে আমাদের মানুষ করেছেন। আমি যে রাজি হচ্ছিলাম না, তার কারণও ছোটবেলায় আমাদের কষ্ট। কিন্তু মা আস্তে আস্তে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন। শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি আগে তো বাবা মারা গেলে নাবালক পুত্র পেত না। পরে সে আইন বদলানো হয়েছে। মায়ের নামে দাদা সম্পত্তি লিখে দিলেন। যেগুলো এখন আমি ভোগ করছি। যাহোক সে অনেক ইতিহাস। আমার বাবাকে আমি কোনোদিন দেখি নি। শুধু জানি সে আমাদের বাবা। মা যদি সেদিন জেদ না ধরত, নানা-নানি যদি রাজি না হতো, তাহলে আমিইবা কোথায় থাকতাম। তোরাইবা কোথায় থাকতি। এটা হলো আমাদের হিস্টিরিকাল লিগাসি। আমার মেয়েও কষ্টের পথ বেছে নিচ্ছে। আমি বাবা হয়ে তাকে সে পথে যেতে রাজি হচ্ছি।'

আব্বা কাঁদতে লাগলেন। আম্মা কাঁদতে লাগলেন। মন্টি উঠে চলে গেল বাথরুমে। সে কান্না লুকুতে চাইছে।

আমি আব্বাকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার চোখে এত জল ছিল, আব্বার বুক আমি ভাসিয়ে দিতে লাগলাম।

কবিরদের বাসায় গেলাম বিকালবেলায়। খালাম্মা ছিলেন। বললাম, 'খালাম্মা, আপনার সাথে আমার একটু কথা আছে। একটু সময় দেবেন।'

'বলো মা কী বলবে?' খালাম্মার সঙ্গে বসলাম তাদের বৈঠকখানায়। কীভাবে কথা শুরু করা যায়? একটু ইতস্তত করে বললাম, 'খালাম্মা! আপনার ছেলের বিয়ের কথা বলছিলেন! মেয়ে খুঁজে পেয়েছেন?'

'না মা। কোথায় আর পেলাম!'

'আমি একটা মেয়ের খোঁজ আপনাকে দিতে পারি।'

'তাই নাকি মা! কোথায় বলো তো!'

'অবশ্য আপনার পছন্দ হবে কি না কে জানে!'

'আগে বলো বৃত্তান্ত শুনি!

'মেয়ে আপনি দেখেছেন! আপনার সঙ্গে কথাও হয়েছে।'

খালাম্মা একটু দম নিলেন। তারপর একটু আবেগভরা কণ্ঠে বললেন, 'মা। আমার সঙ্গে রসিকতা করছো না তো! অযথা আমাকে আশা দিয়ে পরে আশাটা নিভিয়ে ফেলো না মা!'

বললাম, 'না মা। রসিকতা করছি না। সিরিয়াস। আপনি যদি রাজি থাকেন, আপনার ছেলে যদি রাজি থাকে, আমাদের বাসায় প্রস্তাব পাঠাতে পারেন।'

তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'আমি জানতাম! এতো বড় অন্তর তোমার ছাড়া আর কারো হবে না। কারো হবে না! কিন্তু মা তোমার আব্বা-আম্মা তারা কি রাজি হবেন?'

'তাদের মত আদায় করার জন্যেই আমি সময় নিচ্ছিলাম। এখন তাদের রাজি করিয়েছি বলেই আপনাকে বললাম।'

'কবির জানে?'

'না। আমি মা আপনার ছেলেকে একথা বলতে পারব না। আপনি বলবেন!'

'না মা। তোমাকে বলতে হবে না। আমিই বলব!'

কবিরের সঙ্গে দেখা করলাম। ও আজকে এক ধরনের ক্রিয়েটিভ ভাবনায় মত্ত। বলল, হৃদিতা, একটা ভালো কিছু তো আঁকা দরকার। ভাবছি, একটা সিরিজ করব। জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা। অনেক ইমেজ আছে না। চাল ধোওয়া হাত, ভোরের দোয়েল আবার ধরো মিথ, মধুকর ডিঙা নিয়ে যাচ্ছেন, লখিন্দরকে বাঁচাতে বেহুলা ইন্দ্রের সভায় নাচছে। এ সব মিলিয়ে একটা অন্ধকার অন্ধকার রিয়েলিস্টিক ড্রয়িং কিন্তু সুররিয়েলিস্টিক পৃথিবী। স্বপ্নের, স্মৃতির, ইতিহাসের।

হায়রে আর্টিস্ট। আমি এসেছি আমার অতিবাস্তব জীবনের সমস্যা নিয়ে, উনি পরাবাস্তব জগতের গল্প আমাকে শোনাচ্ছেন। আমার প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। শিল্পের অপার্থিব উত্তেজনায় ও শার্টের কলার চিবুতে লাগল।

আমি বললাম, খুব ভালো হবে।

অন্য অনেক বিষয়ে গল্প হলেও বিয়ে নিয়ে কিছু বললাম না। খালাম্মা দায়িত্ব নিয়েছেন। দেখা যাক, উনি কী করেন।

খালাম্মা যে তৎপর হয়েছেন, সেটা বোঝা গেল, পরদিন কবিরের ফোন পেয়ে।

'হ্যালো। হৃদিতা। মাকে তুমি কী বলেছো!'

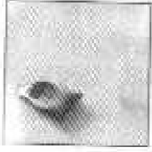
'কেন? যা বলেছি, ঠিকই বলেছি!'

'তুমি মা'র মাথাটা খারাপ করে দিলে কেন?'
'আমি যা বলেছি, তা মিন করে বলেছি!'
'না হৃদিতা তা হয় না!
'কেন হয় না!'
'ফোনে এতো কথা বলা যাবে না। তুমি কি আসতে পারবে?'
'আচ্ছা আসছি।'

এই পাগল আবার কী বলে? সব কিছু ঠিকঠাক করে এনে কি এখন তীরে এসে তরী ডোবাব নাকি? রিকশা নিয়ে চললাম ওদের বাসা। সোজা চলে গেলাম ওর ঘরে।
'বলো। কেন ডেকেছ?'
'হৃদিতা মাকে তুমি কী বলেছ!'
'বলেছি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই!'
'কেন বলেছ!'
'কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি! কারণ আমি যতোদূর বুঝি, তুমিও আমাকে ভালোবাসো। নাকি আমার বোঝার ভুল! তুমি ভালোবাসো না।'
'এটা তুমি কী বললে?'
'কী বললাম মানে। ভালোবাসো কিনা বলো।'
'হ্যাঁ। বাসি। খুব ভালোবাসি।'
'ব্যস। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তুমি যদি তোমার ভালোবাসার প্রতি সৎ থাকো, তোমারও উচিত আমাকে বিয়ে করতে চাওয়া।'
'কিন্তু হৃদিতা, আমার শরীর সিগনাল দিচ্ছে...'
'আমারও অবস্থা বেশি ভালো না।'
'তাহলে!'
'কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া একদণ্ডও থাকতে পারি না। তাই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই!'
'ঠিক আছে। আমার ট্রিটমেন্টের জন্যে সিঙ্গাপুর যাচ্ছি সামনের মাসে। তোমাকেও নিয়ে যাওয়া যাবে। তাতে তোমার ট্রিটমেন্টটারও ...
'ট্রিটমেন্টের লোভে নয়, জান, ভালোবাসার লোভেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই...।' আমি চোখের জল ফেলতে লাগলাম টপটপ করে।
ও আমার চোখের পানি মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তোমার বাসায় মত পাওয়া যাবে?'
'তাদেরকে রাজি না করিয়ে কি আমি তোমাকে বলছি নাকি?'
'এখন তাহলে আমাকে কী করতে হবে?'
'পাগড়ি কিনতে হবে।'

'ব্যস। এইটুকুই।'
'বাকিটা মা করবেন। ফরমালি প্রস্তাব দিতে আমাদের বাসায় যেতে হবে।'
'আর?'
'আর? এখন আমাকে আদর করো।' আমি ওর কোলে গিয়ে বসে পড়লাম।
ও আমাকে চুমু দিতে দিতে বলল, 'দরজা খোলা আছে। মা এদিকে এসে পড়তে পারে।'

আসার আগে দেখা করতে গেলাম ওর মা'র সঙ্গে।
বললাম, 'মা, আপনার ছেলেকে তো বিয়েতে রাজি করিয়েছি!'
তিনি খুশিতে উচ্ছল হয়ে বললেন, 'সত্যি? বুড়ো রাজি হয়েছে?'
'হ্যাঁ, হয়েছে!'
'আল্লাহ তোমার ভালো করবেন মা!'
তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'মারে, তুমি আমার কতো বড়ো যে উপকার করলে... তোমার দয়ার শরীর মা, দয়ার শরীর।' তিনি যে কান্নাটা কাঁদছেন, তাকে মোটামুটি মরাকান্না বলা যায়।
আমি তার চোখের পানি ওড়না দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'ছিঃ মা এভাবে বলবেন না। মা, এবার ছেলেপক্ষের উচিত পাত্রীর বাসায় গিয়ে ফরম্যালি প্রোপোজাল দেওয়া। কবে যাবেন, ঠিক করেন।'
'আমার তো আত্মীয়স্বজন সব দেশের বাইরে। আমিই পড়ে আছি, ছেলের ইচ্ছা, শেষ কটা দিন দেশেই কাটাবে...
'আপনিই চলেন মা আমাদের বাসায়... বলে-কয়ে একটা দিনক্ষণ ঠিক করেন... হৈ-হুল্লোড় করার কিছু নাই, বাসায় কাজি ডেকে বিয়েটা পড়িয়ে নিলেই হবে।'
'ঠিক আছে মা, তাই যাব।'
'মা শোনেন। আমার বাসায় গিয়ে অসুখ-বিসুখ নিয়ে কোন আলোচনা করার দরকার নেই। শুভ কাজের আলাপে অশুভ প্রসঙ্গ না আনাই ভালো, কী বলেন!'
'শোনো মা, তুমি তোমার আব্বা-আম্মাকে জানিয়েছ তো যে বুড়োর দিন আর বেশি নেই...'
'জানিয়েছি মা।'
'সত্যি তো।'
'আপনাকে আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি মা! আপনি তাই ভাবলেন।'
'না না। তা কেন ভাববো?'
'আমি শুধু চাই রোগশোকের কথাটা যেন আর বলাবলি না হয়... এ প্রসঙ্গ কোনো পক্ষই তুলবে না।'
'ঠিক আছে... ঠিক আছে।'



কবিরের কথা

এখন আর কোনো কিছুই আমার ইচ্ছাধীন নয়। একদিকে আমার সবকিছু নির্ধারণ করছে হৃদিতা, আরেক দিকে মা। আর সকল কিছুর ঊর্ধ্বে থেকে নিয়তি তো আমার শেষ-সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেই। আমি শুধু মাকে বলেছি, বেশি লোককে বলার দরকার নেই, তুমি শুধু পল্টনের মামাকে বলো। তাকে নিয়ে একদিন যাও হৃদিতাদের বাসায়। ফোন করে ওর মা'র সাথে কথা বলে তারিখ ঠিক করে ফেলো, কবে যাবে।

মা তারিখ ঠিক করছেন। আমাকে বলেছেন, একটা আংটি, একটা গলার চেইন, গোটা দুয়েক শাড়ি কিনে আনতে। আরে কী সমস্যা, আমি তো সেই সাংসারিক চক্রেই পড়ে যাচ্ছি। আমি কি এসব কিনতে পারি নাকি? হৃদিতাকে বললাম। সে বলল, 'শাড়ি দুটো নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই, আমি কিনে নেব। তুমি একদিন বায়তুল মোকাররমে গিয়ে একটা আংটি কিনে এনো। আমার আঙুলের মাপ জানো তো।'

আমি বলি, 'না।'

'ঠিক আছে, মাপ জানা লাগবে না। তুমি ছোট সাইজেরটা কিনো।'

তাকে বললাম, 'ছোট সাইজ কিনে যদি দেখি আঙুলে ঢুকছে না, তখন? তার চেয়ে বড়টাই কিনি। আঙুলে পরতে না পারলে হাতে পরবে। বরং একটা আংটি দিয়ে যাও। তোমার সাইজ বোঝা যাবে।'

এর ফাঁকে আমি একটু ডাক্তারের কাছে গেলাম। বলা তো যায় না এনগেজমেন্ট করতে গিয়ে দেখা গেল, পাত্র মরে পড়ে আছে। ডাক্তার চেকআপ করলেন। যা যা টেস্ট করতে হয় করলেন। বললেন, আপাতত ঠিকই আছে। ভবিষ্যতটাই খারাপ। আগের বার যখন দেখেছিলাম, তার চেয়ে কিছুটা খারাপ তো হয়েইছে।

আমি মনে মনে বললাম, হবেই তো। হৃদয়ের ওপর দিয়ে ঝড় তো কম গেল না।

মামা, মামি আর ফুপা গেলেন হৃদিতাদের বাড়ি। আমি বাসায় রইলাম। অনেকগুলো ফুল কিনে দিয়েছি, অনেক মিষ্টি, আর সঙ্গে শাড়ি, আংটি। গলার চেইন কিনি নি বলে মা রাগ করলেন আর নিজের একটা হার বের করে বললেন, ঠিক আছে, এটাই দেব। তিনি ওটাই সঙ্গে নিয়ে গেলেন। জমিদার বাড়ির মেয়ে, কম জিনিস তো দিতে পারবে না। আমি হাসলাম। এমন মোটা হার, ওটা ছুড়ে মেরে মানুষ খুন করা যাবে।

ওদের পাঠিয়ে দিয়ে আমার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করছে। আমি একবার টিভি ছাড়ছি। একবার ক্যাসেট প্লেয়ার চালাচ্ছি। একবার খবরের কাগজ নিয়ে বসছি। কিন্তু কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। আমার শুধু মনে হচ্ছে, হৃদিতাকে আমি যত অপমান করেছি, তার প্রাকৃতিক প্রতিশোধ আজ হয়ে যাবে। আজ কোনো না কোনো পয়েন্টে কথা কাটাকাটি লেগে যাবে দু'পক্ষের মধ্যে, তারপর অপমান করে বের করে দেওয়া হবে আমার আত্মীয়-স্বজনকে। এটা কি হতে পারে যে হৃদিতার মতো একটা অসাধারণ মেয়ে আমার বউ হবে?

ফোন এল। দৌড়ে গিয়ে ধরলাম। মা'র গলা। বুড়ো, তুইও চলে আয়।

'কেন মা?'

'নে, তোর মামার সাথে কথা বল।'

মামা ফিসিরফিসির করে বললেন, 'কবির মিয়া, বুঝলে না, শুভ কাজ দেরি করতে নেই। এখন আংটি পরাবে, আবার একদিন বিয়ে করতে আসবে, এর মধ্যে হাজার রকম কথা হবে। দরকার কী? তুমিও যখন রাজি, তোমার মারও খুব আগ্রহ, পাত্রীও রাজি, তাদের গার্জিয়ানরা রাজি, তাহলে আর সমাজটমাজের জন্যে অপেক্ষা করব কেন? আজ তুমি চলে আস। আমরা বিয়েটা রেজিস্ট্রি করে ফেলি। পরে আরেক দিন আমরা অনুষ্ঠান যে সব করার, গায়ে হলুদ, পাত্রী পক্ষের অনুষ্ঠান, বৌভাত-তোমাদের যদি শখ থাকে, করব। আপাতত বিয়েটা ঝুলিয়ে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বাবা।'

'কী বলছেন মামা।'

'গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি আসো। নাও তোমার মা'র সাথে কথা বলো।'

মা ফোন নিলেন। বললেন, 'বুড়ো চলে আয়। ওরা তোর জন্যে আংটি রেডি রেখেছে। ওরা ভেবেছে তুই আসবি।'

আমি বললাম, 'তুমি হৃদিতার সাথে কথা বলো। ও কী বলে?'

একটু পরে ফোন। হৃদিতা। সে সেজে-গুজে বসে আছে। বলল, 'আমাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে, দেখবে না। চলে আসো। শোনো পাঞ্জাবিটা পরে আসো।'

আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী ডাক দিয়েছেন, 'আমাকে তো যেতেই হবে।'

পাঞ্জাবি পরলাম। নিচে গাড়ি এসে গেছে। মতিনের কাছে বিদায় নিয়ে বিসমিল্লাহ্ বলে রওনা হলাম।

প্রথমে এনগেজমেন্ট হলো। মা হৃদিতার আঙুলে আংটি পরিয়ে দিলেন। তারপর ওর আব্বা আমার হাতে পরিয়ে দিলেন আংটি।

বলাবাহুল্য, ভিডিও হচ্ছে এবং ভিডিও-র লাইটের আলোয় সব কিছু ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে বাসায় ভিড় বাড়ছে। হৃদিতার বন্ধুরা, নিকটাত্মীয়রা আসতে লাগল। কোথা থেকে, কেউ একজন, একটা শেরওয়ানিও ভাড়া করে এনে হাজির।

সঙ্গে পাগড়ি।

মামা আমার কানে কানে বললেন, 'আমরাইবা কম যাব কেন? টাকা দে। বিয়ের শাড়ি কিনে আনি। এই তো নিউ মার্কেট যাব, আর আসব।'

আমি বললাম, 'পকেটে তো অত টাকা নাই।'

তিনি বললেন, 'চিন্তা নাই। আমি এটিএম কার্ড দিয়ে টাকা তুলে এখনই শাড়ি নিয়ে আসছি।'

আমি বলি, 'মামা, ব্লাউজ-ট্রাউজের ব্যাপার আছে, লাভ নাই, বাদ দাও।'

মামা বললেন, 'না বাদ দেব কেন? অন্য ব্লাউজ দিয়ে পরবে।'

আমি বুঝলাম, তাকে নিবৃত্ত করা যাবে না। বুদ্ধি করে বললাম, তাহলে আড়ং-এ যাও। এক দামে পাবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে মামা বিয়ের শাড়ি নিয়ে হাজির। কাজি সাহেবও এসে গেলেন। খুবই স্মার্ট কাজী সাহেব। বিয়ে পড়ানোর সময় সব রেডি। উনি আর পড়ান না। ব্যাপার কী?

কাজী সাহেব বললেন, 'বিবাহ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ম্যারিজ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টান্ট ম্যাটার ইন হিউম্যান লাইফ। এটা অবশ্যই ভিডিও করা উচিত। ভিডিও ম্যানকে আসতে বলেন।'

ভিডিও ম্যান এল। তবু তিনি বিয়ে পড়াচ্ছেন না। বললেন, 'একটু ওয়েট করেন।' তিনি পকেট থেকে চিরুনি বের করলেন। ভাবলাম, চুল তো তাঁর টুপির নিচেই থাকবে। আমার ভাবনার জবাব দিয়ে দিলেন তিনি সাক্ষাৎ। চুল আঁচড়ানোর পর তিনি দাড়ি আঁচড়ে নিলেন। তারপর ভিডিও ক্যামেরা অন করা হলো। তিনি খুব সুন্দর স্পষ্ট উচ্চারণে বিয়ে পড়ালেন। কাবিননামায় স্বাক্ষর নিলেন। ভেতর থেকে কবুল বলার সময় স্পষ্টতই ভেসে এল কান্নার আওয়াজ। আর মোনাজাত করার আগে কাজি সাহেব বললেন, 'মোনাজাত হবে, ভেতরে হাত তুলতে বলেন।' মোনাজাতটাও তিনি করলেন খুব সুন্দর, স্পষ্ট ভাষায়।

বিয়ে পড়ানো হয়ে গেলে ঠিক হলো, ১৫ দিন পরের শুক্রবারে বিয়ে আর তার একদিন পরে বউ ভাত হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে। মেয়ে বিদায় হবে তারপর।

দেখুন তো কী মুশকিল। বিয়ে হলো কিন্তু বাসর হলো না।

খেয়েদেয়ে হাত মুছে আমরা চলে এলাম। জোড় বেঁধে অবশ্য মুরুব্বিদের সালাম করতে হলো।

রাত্রিবেলা ফোন পেলাম।

বলল, 'কংগ্রাচুলেশন্স।'

বললাম, 'সেম টু ইউ।'

'কেমন লাগছে।'

'বোকা। বোকা। বিয়ে হলো, কিন্তু বাসর হচ্ছে না। এটা কি ঠিক?'

'না একদম ঠিক নয়। মনে হচ্ছে এক্ষুনি তোমার কাছে চলে যাই।'

'আয় লো সখি উইড়া যাই।'

'নানা ইয়ার্কি না। সত্যি। সিরিয়াসলি। এই তোমার কেমন লাগছে।'

'ভাবছি।'

'ভাবছি মানে?'

'ভাবছি যা ঘটে গেল তা স্বপ্ন না সত্যি?'

'আমিও।'

'ভাবছি এত সৌভাগ্য আমি পেলাম কোত্থেকে। যে পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার মেয়েটা আমার মতো একটা ব্যাঙের গলায় মালা পরাল।'

'আমিও ভাবছি আমার বরাত কেমনে খুলল যে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ লোকটার সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে গেল, এভাবে পরিচয়। আর কিনা তার ভালোবাসা জয় করে নিয়ে তাকে একেবারে বিয়ে পর্যন্ত করে ফেললাম।'

'জীবনটা যদি সিনেমা হতো, এখানেই এটা শেষ হয়ে যেত। তারপর তারা সুখেশান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল। কিন্তু জীবনটা সিনেমা নয়। জীবনের গল্প আসলে শুরু হয় বিয়ের পর।'

'জানো আব্বা কী বলেন? আব্বা বলেন, বিয়ের পরে মানুষের ভাগ্য খুলে যায়। আমাকে বিয়ের পরে যেন তোমার ভাগ্য খোলে।'

'কী জানি। ভয় হয়।'

'কেন?'

'আমাদের কাপলটা তো হলো পারফেক্ট কাপল। এক কাঙাল পেয়েছে আরেক কাঙালের দেখা।'

'না। এভাবে বলছ কেন? বলো উই আর মেড ফর ইচ আদার।'

'সেই। তবে আজ না আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। ও একসিডেন্টে এক পা হারিয়েছিল। ক্রাচ নিয়ে চলতে হয়। ও বিয়ে করল আমাদের আরেক বন্ধুকে। সে অনেক আগে থেকেই ক্রাচ নিয়েই হাঁটে। কত বড় সাহসের ব্যাপার ছিল সেটা। আর আমরা কী করলাম, আল্লাই জানেন। ভয় হচ্ছে।'

'ভয় পাচ্ছ কেন। মিরাকলে বিশ্বাস রেখো। ওই যে গান আছে না দুই দুয়ারীতে রিয়াজ যেটা গাইল।'

'দুই দুয়ারীতো দেখি নি।'

'মিরাকল-এ আস্থা রাখো। এমন তো হতে পারে আমার লাকে তোমার অসুখটা ভালো হয়ে গেল। আর তোমার লাকে আমারটা।'

আমার চোখে জল আসছে। 'এ বিষয়টা নিয়ে আমি কখনও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই নি। ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চেয়েছি। আমি জানি না, অলৌকিক কিছু সত্যিই ঘটতে পারে কিনা। আমার তো লাক ভালো না। আমার বাবা মারা

গেছেন। তাই মারা গেছেন। আমার মৃত্যুঘন্টা বাজছে।'

'আরে না। আমার লাকে তুমি দেখো ঠিকই ভালো থাকবে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে একশ বছর বাঁচবে।'

'আমার বাঁচার কথা ভাবছি না। ভাবছি তোমার কথা। আমার আর্নেস্ট প্রেয়ার, তোমার আগে যেন আমি চলে যেতে পারি।'

'কী সব বলছ। আজকে ভালো একটা দিন।'

'জানো। খুব আব্বার কথা মনে পড়ে। আব্বা বড় অফিসার ছিলেন। সিএসপি। সিএসপিদের ভাট তো জানোই। আর ভাইজান। ও তো বড় ছিল। সব সময় ওর জন্য নতুন কাপড় নতুন জুতা কেনা হতো। আর ওরটা যখন ছোট হয়ে যেত, তখন সেটা আমাকে দেওয়া হতো। এই নিয়ে ছোটবেলায় আমার খুব অভিমান হতো। আমি বরাবরই চুপচাপ। মাকে বাবাকে কোনোদিনও কাপড়ের জন্যে জুতার জন্যে জ্বালাই নি। আর ভাইজান ছিল জেদি,স্পষ্টভাষী। যা দরকার চেয়ে নিত। কান্নাকাটি জেদ করে। একবার তার জন্যে কেনা জুতা আমি আগে পরে ফেললাম। আর খুলি না। ঘুমাতেও গেলাম ওই জুতা পরেই। বাবা তখন আমার জন্যে আরেক জোড়া এনে দিলেন।

কিন্তু সে ক্লাস সেভেনে গেল ক্যাডেট কলেজে। তখন থেকে বিচ্ছেদের শুরু। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার পরই চলে গেল স্কলারশিপ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৮ বছর বয়স হবে তখন তার। আমার ১৪। আজ আমার ৩৮। ২৪টা বছর আমি তাকে দেখি না। সে কোথায় গেছে? কোন দূরে?

তার কাপড় ছোট হলে আমি পরতাম। তার জীবন ছোট হয়ে গেলে সে মনে হয় আমাকে দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু আর কত দিন। স্পেয়ার জীবন দিয়ে তো বেশিদিন চলে না।'

'এ ভাবে ভাবছ কেন? তোমার আয়ু প্লাস তোমার ভাইজানের আয়ু মিলে অনেক আয়ু হলো, এভাবে ভাবো। এমন হয় তো হলো, তোমার আয়ু কমে গেছে, এরপর তোমার ভাইয়ের বাকি আয়ু দিয়ে তুমি ১০০ বছর বাঁচলে।'

'কী জানি। মরতে আমি ভয় পাই না ঠিকই। কিন্তু বাঁচতে আমি ভালোবাসি। আমি বাঁচতে চাই। তোমাকে বাঁচাতে চাই।'

'আমারটা নিয়ে আমি চিন্তিত না। কারণ ক্যান্সারের চিকিৎসা বের হয়ে গেছে। ওষুধ এসে যাবে।'

'আজকে আমাদের একটা অন্যরকম রাত। এটাই তো আসলে আমাদের বাসর। অথচ দেখো কীসব আলাপ করছি।'

'বাদ দাও জান। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমাকে বাসো তো?'

'বাসি বাসি বাসি। আমি তোমাকে অনেক অনেক অনেক ভালোবাসি।'

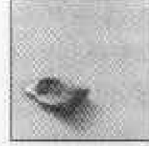
'ব্যস। চুমু নাও।'

'নিলাম। দিলাম। পেয়েছ?'

'হুঁ। পেয়েছি।'

'গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'



হৃদিতার কথা

আবার একটা বিয়ের অনুষ্ঠান করতে হলো। তাদেরকে খাওয়ানোর জন্যে যারা আমার নামে বাসায় নানা বাজে কথা বলেছে, আব্বার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করেছে। আব্বাকেই যারা এসব কথা বলতে পারে, আড়ালে-আবডালে তারা যে আমার নামে আর কী কী কুৎসা ছড়িয়েছে, আমি জানি না। আন্দাজ করলে গা শিউরে ওঠে। এই লোকগুলোকেই নাকি দেখানোটা বেশি জরুরি যে, সুন্দর গাড়ি করে যে হ্যান্ডসাম ছেলেটা আসত হৃদিতাকে নিতে বা দিতে, তার সঙ্গেই হৃদিতার বিয়ে হয়েছে এবং এই লোকগুলোকে অনেক কষ্ট করে আয়োজন করে একবেলা খাওয়ানো হবে, তারা একটা রঙিন কাগজে মোড়া উপহার হাতে নিয়ে আসবে, খাবে, নষ্ট করবে, আর যাবার সময় পান চিবুতে চিবুতে বলবে, নাহ্, রোস্টটা বড় শক্ত ছিল, বোরহানিতে লবণ হয় নাই, কমিউনিটি সেন্টারটা এত ছোট কেন?

কোনো মানে হয় না। তবু আমরা সামাজিক প্রথার দাস। তাদের কথার ভয়েই আমার শ্বশুরবাড়ি যাত্রা ১৫ দিন পিছিয়ে গেল।

যাক, আজ অনুষ্ঠান ভালোয় ভালোয় হয়ে গেছে। টাকা-পয়সা যোগাড় করতে আব্বাকে কিছু কষ্ট নিশ্চয় করতে হয়েছে। আব্বা বোধ হয় প্রফিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলেছেন। আমার আপা সৌদি আরব থেকে আসতে পারলেন না। কারণ এখন ছুটি নেই।

রাত্রিবেলার অনুষ্ঠান। শেষ হতে হতে রাত দশটা বেজে গেল। শাহ নজর হলো হৈচৈ করে। আয়নায় বর-বউয়ের মুখ দেখা। এক গ্লাসে শরবত ভাগাভাগি করে খাওয়া ইত্যাদি। আমাদের কাজিন গোষ্ঠী আর আমার ক্লাসমেট তো কম নেই।

শেষে আব্বা বললেন, না না আর দেরি করা যাবে না। মেয়ে বিদায় করতে হবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আমার আঁচলের সঙ্গে গিট বেঁধে দেওয়া হয়েছে কবিরের পাগড়ির প্রান্ত। আমরা

দুজন একসাথে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি গাড়ি অভিমুখে। তার আগে চলল ম্যারাথন কদমবুসি পর্ব। আমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে আমার বাহিনী। গাড়ির কাছে গেলাম। কান্নার রোল উঠল। সবার আগে কাঁদতে লাগলেন মা।

আমি তার কান্নার কারণটা জানি। এখানকার বেশির ভাগ লোকই জানে না। মেয়েকে যে কোন অজানা সাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছেন তিনি, এই ভয়ে, মেয়ের আসন্ন দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে তিনি আতঙ্কিত।

আব্বার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। তিনি আমার শাশুড়ি মা'র হাতে আমাকে সমর্পণ করলেন। আমি দেখতে পাচ্ছি আব্বা কান্না চেপে রাখতে পারছেন না।

আম্মার আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না, আম্মা কি অজ্ঞান হয়ে গেলেন কি না কে জানে?

মন্টিকে কোথাও দেখছি না। মন্টি বোধ হয় এ কান্নাকাটি সহ্য করতে পারবে না ভেবে কোথাও লুকিয়েছে।

আমি মহাকষ্টে কান্না চেপে রেখেছিলাম। আব্বাকে কাঁদতে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললাম। সারারাত আব্বা বোধ হয় আজ জেগে থাকবেন। মা'র যা অবস্থা, নিজেকে সামলাবেন, নাকি আব্বাকে দেখবেন।

গত কয়েক দিনে মার পরিবর্তনটাই ছিল সবচেয়ে চোখে পড়বার মতো। তিনি একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছেন। সবাইকে সব কিছু জানাবার যে একটা বাতিক ছিল তার মধ্যে সেটা একেবারেই উবে গেছে।

আর মন্টিকেও নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, ছেলের রোগশোক নিয়ে সে যেন কোনো কথা বাইরে না বলে।

গাড়িতে উঠে আমরা রওনা দিলাম। আমার পাশে কবির। তাকে দেখাচ্ছে অপরূপ এক শাহজাদার মতো।

আমি তার কানে কানে বললাম, 'ভেবো না কিছু, আমি ঠিক আছি, কারণ আমার পাশে আছ তুমি। আজ আমার বিজয়ের দিন।'

ধানমন্ডির বাসায় পৌঁছে গাড়িতে কিছুক্ষণ বসতে হলো। কারণ শাশুড়ি মা বধূ বরণ করে নেবেন। তিনি হাতপাখা, মিষ্টি, পায়েস– এসব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। ভিডিওওয়ালারা আগে আগে গিয়ে অবস্থান নিয়ে নিয়েছে।

বাসর ঘরে গিয়ে নিজের মনেই বলে উঠলাম, 'ওয়াও!' আর্টিস্টের ঘর তো। ফুল দিয়ে এত সুন্দর করে আজ সে সাজিয়েছে। ও জানাল, আর্ট কলেজের ছেলেরা সাজিয়েছে।

স্টিল ক্যামেরা ভিডিও ক্যামেরা বিদায় হলো। উফ্ এতক্ষণে একটু শান্তি লাগছে। কদিন থেকেই একদম বিরামহীন ধকল যাচ্ছে।

কবির দরজা বন্ধ করে দিল।

তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, হৃদিতা, আজ তোমাকে খুব সুন্দর

লাগছে, খুব সুন্দর...। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর... জ্যোৎস্না, চাঁদ, ভোরের প্রথম আলো, শিশির ভেজা শিউলি... পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের পেইন্টিং, স্কাল্পচার, তাদের সবার চেয়েও তুমি সুন্দর...

আমি ঘোর লাগা গলায় বললাম, 'এই আমাকে একটু বউ বলে ডাকো না?'

'বউ। আমার লক্ষ্মীসোনা বউ।'

'আজ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। সবচেয়ে। আমি শুধু এতটুকুনই চেয়েছিলাম, তোমার বউ হতে, আজ আমার জীবনের আশা পূর্ণ হয়েছে। আমি তোমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা বাসব।'

ও বলল, 'সাবলীলভাবে আমি ভালোবাসা বাসিব তোমায়', মনে হয় কোনো কবিতার লাইন।

'এত ভালোবাসা যা কেউ কাউকে ভালোবাসেনি।'

'আমি তারও চেয়ে বেশি বাসব।'

'আমি তারও চেয়ে বেশি।'

'দেখা যাবে কে বেশি ভালোবাসতে পারে!'

'দেখা যাবে।'

ও বলল, 'ছোটবেলায় আনোয়ার স্যার বলেছিলেন, ঈর্ষা জিনিসটা খারাপ। একমাত্র লেখাপড়ায় ঈর্ষা ভালো। যে আমি ওর চেয়েও বেশি পড়ব, ওর চেয়েও ভালো করব। আজ আমার মনে হচ্ছে আনোয়ার স্যারকে ডেকে বলি, স্যার, লেখাপড়ার চেয়েও আরেকটা বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা ভালো। ভালোবাসার প্রতিযোগিতা!'

'ঠিক আছে। শুরু হলো আজ থেকে আমাদের ভালোবাসাবাসির কমপিটিশন।'

ঠিক এই সময়ে বিদ্যুৎ চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল রিচার্জএবল লাইটের আলো।

ভেবেছিলাম ভোরবেলা উঠে রান্নাঘরে গিয়ে নাশতা বানিয়ে মা'কে অবাক করে দেব। কিন্তু যখন ঘুম ভাঙল, তখন কেবল এই রবীন্দ্রসংগীত বাজতে পারে, কেন যামিনী না যেতে জাগালে না বেলা হলো মরি লাজে।

কবির তখনও ঘুমুচ্ছে।

তাড়াতাড়ি করে রেডি হয়ে গেলাম ঘরের বাইরে।

মা'র সাথে দেখা হলো । মা বললেন, 'মা মন্টির সাথে দেখা হয়েছে?'

'কই?'

'ওই তো ও-ঘরে।' উঁকি দিয়ে দেখি মন্টি কম্পিউটারে বসে খেলছে।

'কী রে মন্টি তুই কখন এলি?'

'কখন আবার। এসেছি সেই দশটায়। এখন বাজে ১২টা। এই বোকা,

শ্বশুরবাড়িতে কেউ ১২টা পর্যন্ত ঘুমায়?'

'ওরে পাকা ছেলে। তোকে পাকামি করতে হবে না। এই আব্বা কেমন আছে রে?'

'ভালো।'

'মা।'

'ভালো!'

'মা কিছু বলল?'

'না। কী বলবে।'

'মা কি খুব কান্নাকাটি করেছে?'

'হুঁ।'

'আব্বা?'

'পায়চারি করেছে।'

'অনেক?'

'সারা রাত।'

'তুই কী করে বুঝলি সারারাত?'

'ওমা আমিও তো সারারাত জেগেছিলাম।'

কবির এল। বলল, 'কী খবর মন্টি সাহেব। কখন আসা হলো!'

'সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না।' বললাম ওকে।

কবির বলল, 'কেন?'

মন্টি বলল, 'সেই সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বসে আছি। অথচ আপনাদের ওঠারই নাম নেই।'

কবির বলল, 'খাওয়া-দাওয়া কিছু করেছ মন্টি।'

মন্টি মাথা নাড়ল। করেছে।

কবির বলল, 'এই চলো আব্বা-মাকে দেখে আসি। যাবে?'

আমি বললাম, 'এখনই? বিকালে যাই।'

কী বলেন আপনারা। আমার কি বরং দেখা উচিত না মা একা-একা রান্না ঘরে কী করছে?

এমন সময় হৈহৈ করে নাসরিনসহ আমার ৫ বন্ধু এসে হাজির।

আল্লাহ। কী যে প্রশ্ন এখন ওরা করবে। ওদের যা মুখ।

আমি এগিয়ে গেলাম। 'এই তোরা এসেছিস, কী কাণ্ড, আয় বোস।'

নাসরিন বলল, 'চল তো তোর বাসর ঘরটা দেখে আসি। কেমন করে সাজিয়েছে।'

নিয়ে গেলাম। ওরা উল্লাস করে উঠল। ওয়াও, এত সুন্দর।

তিথি বলল, 'সবই ভালো। শুধু একটা জিনিস নাই। ছাদে একটা আয়না লাগিয়ে

নিবি। তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে দেখতে পাবি, একশ কিলোমিটার বেড়ে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সেটা আসছে কোত্থেকে!'

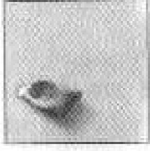
হি হি হি হি হি...

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে কোথায় আছি, বুঝতে সময় লেগে গেল খানিক। ধাতস্থ হলে বুঝলাম, শুয়ে আছি কবিরের পাশে। একটা নীল রঙের ডিম লাইটে সব কিছু নীল হয়ে আছে। বাসর রাতের গোলাপগুলো এখনও পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি। গোলাপের গন্ধে যেন নতুন মাদকতা।

কী সৌভাগ্য আমার। এই মানুষটার পাশে আমি শুয়ে আছি। এ আমার স্বামী। বিয়ের ফুল নাকি স্বর্গে ফোটে। জন্মের পর পরই নাকি কার কোথায় বিয়ে হবে, নির্ধারিত হয়ে যায়। এ লোকটার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যাপারটা আগেই ঠিক করা ছিল। জন্ম-জন্মান্তর আগে। তাই তো দেখামাত্রই তাকে আমার ভালো লেগে গিয়েছিল। তাই তো তাকে দেখামাত্রই আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি। তাই তো তাকে দেখামাত্রই তাকে অধিকার করার জন্যে আমি পণ করেছি এবং সে আমাকে সহজে গ্রহণ করতে চায় নি। আমি তাকে তিল তিল করে ভালোবেসে অর্জন করেছি।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। নতুন মা যেমন তার ঘুমন্ত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক আর প্রসন্ন আর স্নেহার্দ্র হয়ে পড়েন, আমিও আমার ভালোবাসার বিজয়-অর্জনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

প্রথমত আমি তোমাকে চাই
দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই
অশেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে চাই
যদি তুমি আর এক মুহূর্ত বাঁচো, আমি তোমাকে চাই
যদি তুমি আর একদিন বাঁচো, আমি তোমাকে চাই
যদি তুমি আর এক বছর বাঁচো, আমি তোমাকে চাই
যদি তুমি আর এক যুগ বাঁচো, আমি তোমাকে চাই
যদি তুমি আর একশ বছর বাঁচো, আমি তোমাকে চাই
যদি তুমি পরপারে চলে যাও, আমি তোমাকে চাই



কবিরের কথা

হৃদিতা আজ আমার ঘরে। আমাদের দুটি স্বল্পপ্রাণ মানুষের এই ছোট্ট নতুন সংসার তার যাত্রা শুরু করল। আমার বিবর্ণ দিনগুলো হৃদিতা রঙিন করে তুলেছে। এটা খেয়াল করেছেন মা। বেশ কিছু দিন আগে তিনি বলেছিলেন, বুড়ো, মেয়েটা আমাদের বাসায় আসার পর থেকেই তোকে হাসিখুশি দেখছি। আগে তো সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকতি। এখন আবার ছবিও আঁকতে পারছিস।

আসলে আমার অসুখটা ধরা পড়ার পর থেকে আমি আস্তে আস্তে যেন নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলাম। সচেতনভাবে নয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ডাক্তার যদিও বলে দিয়েছেন, হাসিখুশি থাকুন। ঠিকভাবে খান, ঠিকভাবে ঘুমান। কিন্তু হাসিখুশি থাকেন বললেই তো আর হয় না। সেই আমি এখন অনেক বেশি হাসিখুশি। মনে কতটা রং লাগলে মানুষ শেরওয়ানি পাগড়ি পরে বিয়ে করতে যায়। বউভাত করে। ঘরদোর সাজায়। ঘরে আল্পনা আঁকে।

মাও যে খুব খুশি, সেটা আমি বুঝছি। নিজের ছেলে বলে মা আমার প্রতি খুবই স্নেহান্ধ। পৃথিবীর সব সুন্দর নারী একরাতের জন্যে হলেও আমার সংসার করতে এক পায়ে খাড়া, এটা হলো তার ধারণা। আর হৃদিতাকে পেয়ে তো তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন।

বউভাত করা হলো একটা হোটেলে। তাদেরকে শুধু টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাকি সব আয়োজন তারাই করেছে।

এখন আমাকে ফিরানি-তে যেতে হবে হৃদিতাদের বাড়ি। ওখানে থাকতে হবে। এটাই নাকি নিয়ম।

হৃদিতা কিন্তু খুব খুশি। আজ সে যাচ্ছে নিজের বাসা। আমি বললাম, কী এখান থেকে এখানে, দু'রাত বাইরে থেকেই বাড়ি যাবার জন্যে অস্থির।

শুনে সে হাসল।

মাকে বললাম, 'আজকে নাকি ওদের বাসায় যেতে হবে?'

'যা। তাড়াতাড়ি চলে আয়। আজ রাতে কই মাছ রাঁধব।'

'রাতে কি আর আসতে দেবে? ফিরানি না যেন কী?'

'ও। ঢাকায় তো নানান আচার আছে আবার। কিন্তু কইগুলো কি আর কাল পর্যন্ত জিয়ানো থাকবে।'

'এক কাজ করো। আজ কুটে-টুটে ফ্রিজে রাখতে বলো। যেদিন আসব, সেদিন রাঁধবে।'

'শ্বশুরবাড়ির মজার মজার খাবার খেয়ে আসার পর কি আর মাছ মজা লাগবে?'

'ওরা মজার খাওয়াবে, কে বলল?'

'মজার খাওয়াবে না?'

'সে কি তোমার হাতের মতো মজার হবে মা?' মা আমার কথাটা শুনে খুব খুশি। বললেন, 'না তোর শাশুড়িও তো খুব ভালো রাঁধে, আমি খেয়েছি না? শোন, এসব কথা আবার বুড়ো তুই বউমাকে বলবি না। বউমা কিন্তু মন খারাপ করবে।'

হৃদিতা মাকে বলল, 'মা, আপনিও চলেন। দু'রাত থেকে এলে আপনারও একটা চেঞ্জ হবে। ভালো লাগবে।'

'না মা। তাই কি হয়! বাড়িঘর আছে না। সংসার ফেলে কি যাওয়া যায়?'

হৃদিতাদের বাসায় দু'রাত কাটিয়ে এলাম। ভালোই লাগল নতুন জায়গায় অভিজ্ঞতা। যেমন ধরা যাক, ওদের বাসায় পানি থাকে না বলে পানি জমিয়ে রাখতে হয়। শেভ করার সময় ব্যাপারটা নতুন নতুন লাগে। আবার যে কোনো নতুন হাতের রান্না খেতেও কিন্তু প্রথম প্রথম মজাই লাগে। একটা অভিনব স্বাদ পাওয়া যায়। মাঝখানের একটা দিন আবার হৃদিতা আর আমি এসে ঘুরে গেছি ধানমন্ডির বাসা থেকে। হৃদিতা হাতে করে তরকারি নিয়ে এসেছে মা'র জন্যে। আমিও আবার রান্নাঘরে ঢুকে মা'র হাঁড়ি থেকে একটা মুরগির গিলা তুলে খেয়ে নিয়েছি মাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। তা দেখে মা কিন্তু খুশি।

ফিরে আসার পর মা-ই বললেন, 'তোরা হানিমুনে যাবি না কোথাও?'

বললাম, 'তুমি মা এসব কথা কোথায় শিখেছ? আমাদের আবার হানিমুন কী? আমাদের হানিমুন হবে ব্যাংককে। হাসপাতালে।'

হৃদিতাদের বাসা থেকে ওর পাসপোর্টটা আনা হলো। আমরা দুজনই ব্যাংকক যাব। ওখানে ওর আমার দুজনের চেক আপ হবে। ট্রিটমেন্ট হবে। যতদিন লাগে, চিকিৎসা করাব। টাকা-পয়সা যোগাড় করতে হবে। মামার কাছে আমাদের বেশ কিছু টাকা লগ্নি করা আছে। মামা মাসে মাসে টাকা দেন। সেই টাকা থেকে আমাদের মাসের খরচ চলেও বেঁচে যায়। মা তার বাপের বাড়ির জমি বেচে একসঙ্গে পেয়েছিলেন অনেক টাকা, সেগুলো দিয়ে ঢাকার পাশে সাভারে ধানি জমি কিনে রেখেছিলেন। ২০ বছরে জমির দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে অবিশ্বাস্য একটা অঙ্ক। গত বছর একটা প্লট মামা কিনে নিয়েছেন কারখানা করার জন্যে। নগদ যা পাওয়া গেছে, তা দিয়ে আমার চিকিৎসা খরচ চলছে। হৃদিতারও চলে যাবে।

আমি হৃদিতাকে বললাম, 'হৃদি, তোমার কাগজপত্রগুলো আনো। যাবার আগে তাড়াহুড়ায় আবার মনে থাকবে না?'

হৃদিতা বলে, 'কিসের কাগজ যেন।'

'ট্রিটমেন্টের। ডাক্তার তালুকদারের প্রেসক্রিপশনগুলো নেবে। এখানে যে টেস্টগুলো হয়েছে, সেগুলোও নাও।'

'নেব এখন। যাবার আগের দিন নিলেও তো চলবে নাকি।'

মা কিন্তু তার বউমাকে খুব আদর-যত্ন করছেন। পাখিমা যেমন তার শাবকদের আগলে রাখে, তেমনি করে যেন বুক দিয়ে আগলে রাখতে চাইছেন তিনি তার দুটি ছেলেমেয়েকে। হৃদিতাকে রান্নাঘরের আশপাশে যেতে দেন না। এক গ্লাস পানি পর্যন্ত তার ঢেলে খাওয়া নিষেধ। তার বউমা একা একা গেল কলাবাগানে। আমাকে যে কত কথা শুনতে হলো। 'তুই কেন তাকে একা একা ছেড়েছিস। গাড়ি নিয়ে গেছে তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। গাড়ি নিয়ে গেছে।'

একটু পরে দেখা গেল, গাড়ি নিচে ড্রাইভার ধুচ্ছে। হৃদিতা রিকশায় গেছে।

মার চিল্লাচিল্লি দেখে কে? শেষে ড্রাইভারকে বকতে লাগলেন, 'তুমি আর গাড়ি ধোওয়ার সময় পেলে না? তোমার ভাবি যে রিকশায় গেল, সে খেয়াল আছে?'

একদিন হৃদিতা ঘুমিয়েছে, আমি পানি খেতে গেছি ডাইনিংয়ে। মা বললেন, 'বুড়ো, একটু শুনে যাবি। তোর সঙ্গে কথা আছে!'

আমি গেলাম মা'র রুমে।

অনেকদিন এ রুমে আসা হয় না। দেয়ালে টাঙানো বাবার কোট-টাই পরা বড় ছবিটাকেও কেমন অতিথি অতিথি লাগছে। মা'র ফ্যানটা ময়লা হয়ে গেছে।

মা বললেন, আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় বুড়ো...

আমি ভ্রূ কুঁচকে তার মুখের দিকে তাকালাম। মায়েদের কতগুলো অলসা সন্দেহবাতিক থাকে।

তিনি বললেন, 'বউমা-র অসুখটার কথা বলছি। আমার যেন মনে হচ্ছে কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে।'

আমি বিরক্তভরা কণ্ঠে বললাম, 'গণ্ডগোলের কী আছে। আমি ওর রিপোর্ট দেখেছি। রেজাল্ট পজিটিভ। ম্যালিগন্যান্ট। সব জেনেশুনেই তো আমরা এগিয়েছি, নাকি?'

মা বললেন, 'সেটাই তো আমি বলছি। কিন্তু বেয়াইন সাহেবান তো মনে হলো এসব কথার কিচ্ছু জানে না। আমি বলি আপনার মেয়েকেও ব্যাংককেই চিকিৎসা করানো হবে। উনি বলেন, কেন বেয়াইন, মেয়ের কি আমার কোনো অসুখ-বিসুখ করেছে? আমি বললাম, না না, নতুন অসুখ আর কী করবে। ওই যে ওর আগের অসুখটা, ওর না গলব্লাডার অপারেশন হলো, পরে সেটা টেস্ট করে...

বেয়াইন সাহেবান যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, কী বলছেন বিয়াইন সাহেবান, হৃদিতার আবার কবে অপারেশন হলো। আমাদের কেন কিছু জানান নি।

আমি বলি, আরে না। আমরা কি জানাব। বিয়ের আগে হয়েছে না? উনি বললেন, না তো। ওকে তো জীবনেও কোনোদিন কোনো হাসপাতালে ক্লিনিকে নিতে হয় নি। শুধু একবারই ও হাসপাতালে গেছে, কবিরের সঙ্গে।

মা'র চোখে হাসি আর জল একই সাথে খেলা করছে। তিনি বললেন, 'বুড়ো, হয় ওর মা আমাকে লুকোচ্ছেন, না হলে ও তোকে মিথ্যা বলেছে...'

আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। আমি এমন বিপদে পড়লাম। একদিকে আমার মনে আনন্দ, আমার হৃদিতার কোনো অসুখ নেই, অন্য দিকে আমার মনে ওর জন্যে আফসোস, হৃদিতা এটা কী করল? নিজের জীবন নিয়ে সে জুয়া খেলল।

আমি মা'র বিছানায় বসে আছি। আমারও চোখ দিয়ে একই সঙ্গে হাসি আর অশ্রু ঝরছে।

ধীর পায়ে আমি আমাদের ঘরে এলাম।

হৃদিতা ঘুমুচ্ছে। তার গায়ের ওপরে একটা কম্বল। মাথার চুল খোঁপা করা। সে একটা সিনথেটিকের ম্যাক্সি পরে আছে। নীল রঙের। কাঁধের কাছটা দেখা যাচ্ছে। আমি দরজাটা ভেতর থেকে লাগিয়ে দিলাম। বাতি জ্বালালাম। তারপর আস্তে করে ঢুকে পড়লাম কম্বলের নিচে। ওর লং ড্রেসের কোমরের কাছে একটা বাঁধন। সেটা খুলে ফেললাম। আস্তে করে ওর পোশাকটা সরিয়ে ফেললাম কোমর থেকে, বুক থেকে, পেট থেকে। তারপর সরিয়ে দিলাম কম্বলটা।

টিউব লাইটের ধবধবে আলো যেন লজ্জা পাবে ওর বুকের আলোয়, কোমরের উজ্জ্বলতায়, ত্বকের মসৃণতায়। কিন্তু এখন আমার অন্বিষ্ট ওর সৌন্দর্য নয়, ওর উত্তাপ নয়, বরং একটা দাগ। ওর নাকি গলব্লাডার অপারেশন হয়েছিল, স্টোন ক্রাশ, ল্যাপারোস্কোপি, যাই হোক না কেন, সামান্য হলেও দাগ তো থাকবে।

না, নেই।

হৃদিতা আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।

হৃদিতার কাছে ভালোবাসার পরীক্ষায় আমি হেরে গেছি।

হৃদিতা আমাকে ঠকিয়েছে।

একটা মেয়ে এত ভালোবাসতে পারে। এতটা!

আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হুহু করে কেঁদে উঠলাম। ওর স্বর্ণতনুতে আমার চোখের তপ্ত জল পড়তে থাকলে ও কেঁপে উঠল। ওর ঘুম গেল ভেঙে। ও চোখ খুলে দেখতে পেল যে ও নিরাবরণ। আর আমি ওকে দেখছি। ও আমাকে ওর বুকে টেনে নিল। ওর ঠোঁট রাখল আমার ঠোঁটে। বলল, স্বপ্ন দেখছিলাম, তুমি আমাকে আদর করছ। করো।

আমার শরীরে কোনো সাড়া জাগছে না। এই মেয়ে এটা কী করেছে। এই মেয়ে কেন আমার জন্যে তার জীবন দিয়ে দিল।

ও বলল, 'কী হয়েছে?'

আমি কাঁদতে লাগলাম। ওর বুক আমার চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

ও বলল, 'তোমার কী হয়েছে?'

আমি বললাম, 'কেন তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছ?'

সে চমকে উঠল। বলল, 'কী?'

'তোমার শরীরে অপারেশনের দাগ কই?'

ও হেসে বলল, 'আমাকে দোষ দিও না। বিয়ের আগেই আমি তোমার সামনে ন্যুড সেশনে পোজ দিয়েছি। তুমি তখন চেক করে নাও নি? এখন দোষ দিচ্ছ কেন?'

আমি হাহা করে কেঁদে উঠলাম। তাই তো! তখন আমি কেন আর্টিস্টগিরি দেখিয়েছি। আমি কেন তখন ওর কেবল এনাটমি দেখেছি, ফিজিওলজি নয়?

তাহলেই তো আমি ওর চালাকি ধরে ফেলতে পারতাম।

ও আমাকে ওর বুকের সঙ্গে ঠেসে ধরে বলল, 'জান, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারতাম না। আমার ক্যানসার হলেও তো আমি ছয় মাস এক বছর বাঁচতাম, কিন্তু তোমাকে না পেলে আমি একদিনও বাঁচতাম না। কেঁদো না, কেঁদো না। এসো আমাকে আদর করো। এসো।'

ও সক্রিয় হয়ে উঠল। আমার পোশাক ও খুলে ফেলল। ওর নখ বসিয়ে দিল আমার পিঠে। ওর দাঁত আমার বুকে। আস্তে আস্তে আমার ভেতরের ঘুমন্ত বাঘটা জেগে উঠল। ক্ষেপে উঠল। গর্জে উঠল। ঝাঁপিয়ে পড়ল নখর থাবা আর মাংসাশী দাঁতসমেত।

আমরা তুমুলভাবে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসলাম।

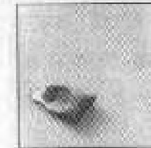
ও বলল, ছাদে একটা আয়না থাকলে বেশ হতো!

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার যে অসুখ, সেটা তুমি জানতে?

ও বলল, হুঁ। আমি তোমাকে এত ভালোবাসি, তোমার চোখ দেখলে বুঝি যে তুমিও আমাকে ভালোবাসো, কিন্তু তোমার কাছে গেলে তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দাও, আমাকে তাড়িয়ে দাও, আমার তখন নিজেকে এত ছোট লাগত, কুকুর বিড়ালের মতো লাগত, কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি, পাগলে মতো ভালোবাসি, আমি তোমাকে চাই-ই চাই। যেদিন তোমার বাসায় গিয়ে খুব অপমানিত হয়ে ফিরে এলাম, সেদিনই একটা ফোন পেলাম। তোমার মা'র ফোন। মা ফোনে সব বললেন। বললেন, মা তুমি দুঃখ পেয়েছ আমি জানি। তবু তুমি আমাকে আর আমার ছেলেকে ক্ষমা করে দিও। কারণ ও যে তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, তাতে ও-ও কষ্ট পাচ্ছে। তবু দিচ্ছে, সে তোমারই ভালোর জন্যে। কারণ আমার ছেলের একটা অসুখ আছে। অসুখটার নাম হলো কার্ডিওমায়োপ্যাথি। ওর হার্ট ধীরে ধীরে বিকল হয়ে যাচ্ছে। ও মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছে। ও আর বেশিদিন বাঁচবে না।

কম্বলের নিচে শুয়ে আছে হৃদিতা। এ কথা বলতে গিয়ে ওর চোখ উঠল ভিজে। ও বলে চলল, তারপর আমি কী করব, আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমি চাচ্ছিলাম তোমাকে ভুলে যেতে। কিন্তু পারছিলাম না। আমি আরো বেশি করে করে তোমার ভালোবাসার জালে যেন জড়িয়ে পড়তে লাগলাম। আমি ঠিকভাবে খেতে পারছিলাম না। রাতে ঘুম হতো না। আমি শুকিয়ে যেতে লাগলাম। আমার চোখের নিচে কালি পড়তে লাগল। এই সময় আমার এক ফুপুর গলব্লাডারের পাথর অপারেশন হয়। অপারেশনের পর তার স্পেসিমেন আমাকে দেওয়া হয় পাশের ডায়াগনস্টিক সেন্টারে টেস্ট করতে জমা দেবার জন্যে। আমি জিজ্ঞেস করি, এটা কী টেস্ট। ওখানে, ক্লিনিকের বারান্দায় আমাকে বলা হলো, এটা ক্যানসার কিনা তারই পরীক্ষার টেস্ট। আমি স্পেসিমেন জমা দিয়ে আসি। পরে যখন রেজাল্ট আনতে যাই, দেখি ননম্যালিগন্যান্ট। অর্থাৎ ক্যান্সার নয়। আমি জিজ্ঞেস করি ক্যান্সার হলে কী হতো। ওরা জানায়, এখানে পজিটিভ লেখা থাকত, এখানে মন্তব্য থাকত এ-রকম। মুহূর্তে আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। আমি কাগজ-পত্রগুলো ফটোকপি করি। কায়দা করে ফটোকপি করে রিপোর্টের পাতা বানাই। তারপর নীলক্ষেতে গিয়ে কম্পুটারে একই রকম কায়দায় আমার নামে আমি ক্যান্সারের রায় তৈরি করি। পুরো কাজটা করতে আমার দু'ঘন্টা সময় আর অল্প কিছু টাকা ব্যয় হয়। আর আমি আমার মেডিক্যাল কলেজে পড়া বন্ধুদের কাছ থেকে এ বিষয়ে আরো জানার চেষ্টা করি। তারা আমাকে গলব্লাডারের ক্যান্সার সম্পর্কে জানায়। কিন্তু সেসব লক্ষণ তো আর আমার শরীরে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার দরকারও হয় নি। আমার একটাই ভয় ছিল তোমরা বিয়ের আগেই আমার ক্যানসার সম্পর্কে না আমাদের বাসায় কিছু বলে ফেলো। আমার মিথ্যাভাষণ ধরা পড়ে যায়। এজন্যে আমি মাকে, মানে তোমার মাকে বারবার বলে দেই যেন কারো কোনো অসুখ নিয়ে কেউ কোনো কথা না বলে। আমরা সবাই আসলে ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চাই।'

হৃদিতা বলছে। আমি শুনছি। আমার বুকের মধ্যে কত কষ্ট হচ্ছে, আমি আপনাদের বোঝাতে পারব না। সত্যি, হৃদয়টা যদি খুলে দেখানো যেত।



হৃদিতার কথা

আমরা ব্যাংকক থেকে ঘুরে এসেছি। ব্যাংকক দেখে আমি মুগ্ধ। মুগ্ধতা শুরু হলো এয়ারপোর্ট থেকে। এত বড়, এত পরিচ্ছন্ন, এত সুন্দর। লাইন ধরে ইমিগ্রেশন পার হলাম। হোটেল আগে থেকে বুক করা ছিল। হোটেলের গাড়ি আমাদেরকে নিতে আসবে। আমাদের নামের প্লাকার্ড নিয়ে এক থাই দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম, গাড়ির

ড্রাইভার। আমরা গাড়িতে উঠে পড়লাম। গাড়ি চলছে, আমি বিস্মিত চোখে দু'পাশের দৃশ্য দেখছি, এত ঝকঝকে রাস্তা, সবাই ছুটছে, কেউ হাঁটছে না, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা উঠে পড়লাম ফ্লাইওভারে, একতলা, দোতলা, তিনতলা রাস্তা, কত বড় বড় পিলারের ওপর দিয়ে।

কবির বলল, ব্যাংককে এলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। এশিয়ান একটা দেশ, আমাদের এত কাছের একটা দেশ, কত উন্নত, আর আমাদের ঢাকা কত নোংরা, কত বিশৃঙ্খল।

এরপরে যে কদিন ব্যাংকক ছিলাম, আমার এই একটাই অনুভূতি আমার হয়েছে, এরা এত উন্নতি করল, অথচ আমরা কেন পারি না। আমাদের নগরপিতারা কি একবার ব্যাংককেও আসেন নি?

আমরা হাসপাতালে গেলাম দ্বিতীয়দিন। হাসপাতাল দেখে আমি মুগ্ধতায় যেন মরে যাই। এটা কি হাসপাতাল? এতো দেখছি ফাইভ স্টার হোটেলের চেয়েও বেশি পরিষ্কার। ট্যাক্সি একেবারে রিসেপশনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে রিসেপ্‌শনিস্টররা। আমাদের জিজ্ঞাসার জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিল হেসে হেসে।

আর লিফট যে কতগুলো, কত প্রশস্ত।

কবিরের চেকআপ হলো। সে তো এখানে আগেও এসেছে। এবার তার রিপোর্ট দেখে ডাক্তাররা বেশ গম্ভীর। তার মানে তার অবস্থা বেশ খারাপ। ওষুধ বদলে দিলেন ডাক্তাররা।

ভেবেছিলাম বেশ কিছু কেনাকাটা করব। মন্টির জন্যে কিছু, দুই মা'র জন্যে কিছু। কিন্তু ডাক্তারদের কথা শুনে আর ভরসা হলো না।

'চলো তোমাকে অন্তত ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টারটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।' বলল কবির।

'আমাদের হোটেলের কাছেই নাকি! ঘরে বসে থেকে কী করব? চলো।'

গেলাম দুজন। গমগম করছে মার্কেট। বহুতল। অনেক এস্‌কেলেটর। ঝকঝকে মেঝে। নানা ব্র্যান্ড আইটেমের দোকান। মন্টির জন্যে জিন্‌সের প্যান্ট সহজেই কিনতে পারলাম। আব্বার জন্যে শার্ট। কিন্তু দুই মা'র জন্যে কী কিনি। আমরা এ-দোকান ও-দোকান ঘুরছি।

এমন সময় হঠাৎ এক বাঙালি কণ্ঠ, আরে আরে কবির ভাই না?

'তুমি? তুমি...রাজ্জাক।'

'যাক। চিনছেন তাইলে?'

'নাও রাজ্জাক তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। আমার স্ত্রী। হৃদিতা। আর হৃদি, রাজ্জাক হলো আমার এক ব্যাচ জুনিয়র, ইন্সিটিটিউটে। জুনিয়র হলেও ফ্রেন্ডই বলা যায়।'

'হ। তা কওয়া যায়। চলেন ভাবি কী কিনবেন, আপনেরে হেল্প করি।'

রাজ্জাক সাহেব আমাদের সঙ্গী হলেন। এমন মজার মানুষ আমি আর জীবনে দেখি নি। সেল্‌স গার্লগুলো সুর করে ডাকছে, হ্যালো মিস্টার, কাম সি, ভেরি চিপ।

রাজ্জাক সাহেব বাংলায় বলেন, হ, ছেড়ি, খুব তো কইতাছ চিপ, তারপর দিবা তো ধরায়া হাজার বাথ। আর হেসে বলেন, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। দেখিস ছেড়ি ইজ্জত রাখিস।

মেয়েদের শাড়ি-টাড়ি তো আর এ মার্কেটে নেই। এখানে আছে টপ্‌স, স্কার্ট, এসব। ভাবলাম ব্যাগ কিনি। দুটো ব্যাগ কিনলাম। রাজ্জাক সাহেব আমাকে হাসিয়েই চলেছেন, সেলস গার্লগুলোকে হেসে বলছেন, থ্যাংক ইউ মিস, ছেড়ি রে ছেড়ি দিলি তো বাঁশ, ওরে বান্দরি আবার ভেটকি মাইরা হাসস, থ্যাংক ইউ।

দুটো ব্যাগ দুই মা'র জন্যে কেনা শেষে রাজ্জাক সাহেব বললেন, চলেন কবির ভাই, ওই পাড়ে যাই। থাই গোল্ড কিনেন। খুব বিখ্যাত জিনিস।

আমরা ওভারব্রিজ দিয়ে রাস্তা পার হয়ে আরেকটা মার্কেটে ঢুকে পড়লাম। একটা বড় দোকানের একটা অংশ সোনার জিনিসের।

কবির বলল, 'পছন্দ করো।'

আমি বললাম, 'না না, টাকা-পয়সা নষ্ট করতে হবে না। চলো যাই। আমি সোনা নেব না।'

কবির আমাকে একটা চমৎকার চেইন আর সাথে দুটো কানের দুল কিনে দিল। দাম অবশ্য ঢাকার মতোই। কিন্তু জিনিস খুবই ভালো।

এখন ওর জন্যে আমি কী কিনি? দ্রুত একটা পারফিউমের দোকানে ঢুকে পড়লাম। নামি ব্রান্ড। ফরাসি। নাকে ধরে গন্ধ পরীক্ষা করে করে একটা পছন্দ হলো। পার্স থেকে বাথ বের করে দিয়ে দিলাম। বন্ধুদের জন্যে কিনলাম অনেকগুলো চাবির রিং, ছোট ছোট শোপিস, টাই। ফুটপাতের একটা দোকানে দাঁড়িয়েই। ব্যস কেনাকাটা খতম।

আমরা ঢাকায় ফিরে এলাম।

আমি আবার ঠিকমতো ক্লাস শুরু করলাম। ও ব্যস্ত হয়ে পড়ল ছবি আঁকা নিয়ে। দিন ভালোই যাচ্ছিল। আমাকে সাহায্য করার জন্যে দুলালি নামের একজন পিচ্চিকেও রাখা হয়েছে।

এর মধ্যে একদিন আমি গেছি রান্নাঘরে, একটা ডিম পোচ করব বলে। মা ছুটে এলেন। বললেন, বউমা, তোমাকে তো এত কিছু করতে হবে না।

আমি বললাম, এত কিছু কোথায় দেখলেন মা। শুধু ডিম পোচ।

'চুলার কাছে তুমি এসেছ কেন? যাও ভাগো।'

'একটা ডিমও পোচ করতে পারব না?'

'না পারবে না। আমি যত দিন বেঁচে আছি বউমা, আগুনের আঁচ তোমাদের গায়ে লাগতে দেব না। দেখি দাও...

'মা ডিম আমি জীবনে বহুত ভেজেছি। এটাকে রান্না করা বলে না।'

'আগে ভেজেছ, ভেজেছ, কিন্তু এখন আর চলবে না। উঁহু কক্ষনো না। নাহলে আমি বাবুর্চি রেখেছি কী করতে।'

হঠাৎ দুলালির চিৎকার। আম্মা আম্মা ভাইজান জানি কেমন কেমন করতেছে আম্মা ভাবি...

কিসের ডিম পোচ, কিসের কী, আমরা ছুটলাম ঘরের দিকে। আমার বুক থেকে যেন আত্মা বেরিয়ে যাবে, এমন ভয় পেয়ে গেছি।

কবির পড়ে আছে বিছানায়। তার একটা হাত বুকে। ঘামছে।

সে বলল, 'না না আমি ঠিক আছি। ইনহেলারটা দাও।'

এক লাফে অয়ারড্রবের ওপর থেকে ইনহেলারের শিশিটা এগিয়ে দিলাম। ফ্যান বাড়িয়ে দিলাম ফুল স্পিডে।

মা বললেন, 'আমি যাই দেখি ডাক্তার রিয়াজকে একটা ফোন করি।'

কবিরের কাছে গেলাম। তার হাত ধরে রইলাম। মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডাকছি। আর ভাবছি, আমি কিছুতেই তাকে মরতে দেব না। দেখি আমার হাত থেকে কে তোমাকে নিয়ে যায়।

কবির বলল, 'আমাকে হার্ট হাসপাতালে নাও।'

বললাম, 'দুলালি, ড্রাইভারকে গাড়ি আনতে বল, দৌড়।'

দুলালি আল্লা গো মাগো বলে দৌড় ধরল।

মা এসে বললেন, 'ডাক্তার তো বলে হার্ট হসপিটালে নিতে।'

ড্রাইভার বসেছিল ভাত খেতে। সে ভাত খাওয়া ফেলে এল ছুটে। আমরা ধরাধরি করে তাকে নিয়ে গাড়িতে তুললাম। আমি ওর মাথা ধরে বসে রইলাম পেছনের সিটে। মা সামনের সিটে।

একদিন ও আমাকে এইভাবে তুলে নিয়ে গিয়েছিল পথ থেকে। বাঁচিয়েছিল মৃত্যু আর বিপদের হাত থেকে। আজকে আমি কি তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারব?

সরাসরি ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হলো। ডিউটি ডাক্তার ওকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলেন। ভর্তি করে নেওয়া হলো ওকে। ওর জায়গা হলো ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট।

আমাদের ওখানে ঢোকা নিষেধ। আমরা বাইরে কাচ দিয়ে ওকে দেখতে পাচ্ছি।

মুখে অক্সিজেনের মাস্ক। হাতে স্যালাইনের সুচ। মাথার ওপরে স্যালাইনের ব্যাগ। পাশে মনিটর। পর্দায় হৃদয়-লিপি ওঠানামা করছে। আর সব শুয়ে আছে। প্রায় অচেতন। জীবনের লক্ষণ কেবল ওই মনিটরে। কার্ডিওগ্রাফের ওঠানামায়।

নাকে স্যাভলনের গন্ধ। চারদিকে নীরবতা। মা-কে দেখাচ্ছে পাগল-পাগল। তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে তার হেঁচকি মতো উঠছে।

আমি তার হাত ধরলাম। তিনি আমার কাঁধে মাথা রাখলেন। আমার কাঁধ কী এমন শক্ত! কীবা এমন বয়স আর অভিজ্ঞতা আমার! তবু আমার চেয়ে বয়স আর অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এই মহিলা আমার কাঁধেই রাখছেন তার মাথা। অসহায়ভাবে আশ্রয় খুঁজছেন। সান্ত্বনা খুঁজছেন। খুঁজছেন আশ্বাস। কিন্তু আমি কার কাছে খুঁজব নির্ভরতা। ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি আর কাউকে জানি না। আমি আর কিছুই বুঝতে চাই না।

আমার দু'চোখ গরম পানিতে থই থই করতে শুরু করল। আমার নাক দিয়ে পানি ঝরতে লাগল অঝোর ধারায়। আমি বললাম, হে আল্লাহ, আমার আয়ু নিয়ে তুমি আমার কবিরকে বাঁচিয়ে তোলো।

আস্তে আস্তে সময় কেটে যাচ্ছে। এভাবে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলে তো চলবে না। কলাবাগানের বাসায় খবর দিতে হবে। মামা-শ্বশুরকে খবর দিতে হবে।

মাকে একটা চেয়ার করে বসিয়ে দিয়ে আমি গেলাম ফোন করতে। আমাদের হাসপাতালগুলো থেকে রোগীদের ফোন করার ব্যবস্থা ভালো থাকে না কেন, আল্লাহ জানে। ব্যাংককে তো প্রত্যেক রোগীর জন্যে একটা করে ফোন! সেটাই কি স্বাভাবিক নয়?

মাকে যে ফোন করে খবর দেব, মা'র প্রতিক্রিয়া কী হবে, ভেবে ভয় হচ্ছে। আমার ভালো মানুষ মা-টা আমার এ-বিয়ে নিয়ে কিছুই বলেন নি। তিনি মেয়েরও বিরোধিতা করতে পারেন না, আবার স্বামীরও না। শেষে মেয়ে আর তার বাবা একমত হয়েছে, মা'র মতটা আর কেউ জানতে চায় নি। আমার বিদায়ের দিন মা কত কান্নাকাটি করছিলেন!

মা এলেন। আব্বা এলেন। আমি খুব স্বাভাবিক আচরণ করলাম তাদের সাথে। বললাম, ঘুমের ওষুধ দিয়েছে তো তাই ঘুমিয়ে আছে। অবস্থা তত খারাপ নয়। মাকে বললাম, ভেতরে যাবা। স্যান্ডেল খুলে গিয়ে একবার দেখে আসো। মন্টি কবে আসবে?

মন্টি গিয়েছিল স্কাউটের জাম্বুরিতে। ক'দিন পরে ও যখন ফিরে এল, কবিরকে তখন সাধারণ কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে। এখন কবিরের অবস্থা অনেক ভালো। এবারের মতো ওর বিপদ কেটে গেছে। তবে চূড়ান্ত বিপদের সংকেত এবার বেজে উঠল।

আমি কেবিনে কবিরের শিয়রে বসে আছি। তার চুল নেড়ে দিচ্ছি। দরজা খুলে মন্টি উঁকি দিল। কবিরই ওকে দেখল প্রথম।

বলল, 'এসো মন্টি, ভেতরে এসো।'

মন্টি ভেতরে ঢুকল। বলল, 'কী ব্যাপার, দুলাভাই, আমি কয়দিন ঢাকায় নাই, আর আপনি নিজের ঘরবাড়ি বদলে ফেলেছেন, এটা তো ঠিক নয়।'

কবির বলল, 'সত্যি এটা অন্যায় হয়ে গেছে। তোমার কাছে পারমিশন নেওয়া হয় নি।'

আমি বললাম, 'কী তুই আমাদের খোঁজে বাসায় গিয়েছিলি নাকি?'

মন্টি বলল, 'আরে না। এসেই শুনলাম এ অবস্থা। চলে এলাম।'

কবির বলল, 'ভিআইপি গেস্ট এসেছে হৃদি, ওকে খাবার-টাবার দাও।'

বললাম, 'কী খাবি, কমলা আছে, বিস্কুট আছে।'

'না কিছু খাবো না।' মন্টি বড়দের মতো ভঙ্গি করছে।

বললাম, 'মন্টি, আজকে ওর ডিসচার্জ।'

ও বলল, 'ভাগ্য ভালো আজ আমি এসে গেছি, না হলে তো ডিসচার্জটাও আমাকে ছাড়াই করতে।'

কবির হাসল, 'একথাটা অবশ্য তুমি ভালো বলেছো।'

দরজায় টোকা পড়ল। ড্রাইভার। বলল, 'ভাবি গাড়ি আনছি। জিনিসপত্রগুলান কি নামাইতাম?'

বললাম, 'নামাও।'

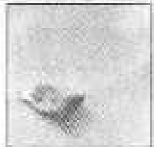
মন্টি বলল, 'আমিও হেল্প করতে পারব। ভালোই হলো। দাও আমাকে কিছু জিনিস দাও।'

ড্রাইভার জিনিসপত্র কিছু জিনিস নিয়ে নিচে নেমে গেল। কিছু জিনিস নিল মন্টি। আমি গেলাম ডিসচার্জ সার্টিফিকেট আনতে।

ফেরার সময় দেখি, মন্টি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আমাকে দেখেই চোখ মুছে তাড়াতাড়ি মুখে হাসি আনার চেষ্টা করল। ইস রে আমার জন্যে আমার এতটুকুন ছোট ভাইটাকেও বড়দের মতো আচরণ করতে হচ্ছে । বাইরে হাসি, গোপনে কান্না।

আমরা ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে এলাম।

মা ফোন করলেন কলাবাগান থেকে, হৃদি, আল্লার কাছে হাজার শোকর যে জামাই সুস্থ হয়ে উঠল। আমি তো কোরান শরিফ এক খতম দিয়েছি। আজ বিকালে আমাদের বাসায় কজন মিসিকিন খাওয়াব। পারলে আসিস।



কবিরের কথা

আমার শরীরটা নাটকীয়ভাবে খারাপের দিকে যাচ্ছে। অবশ্য নাটকীয় কথাটা ঠিক হচ্ছে কিনা আমি জানি না। কারণ শরীর যে খারাপ হবে, এটা জানা কথা। সেক্ষেত্রে এটা গ্রিক ট্রাজেডির মতো। পূর্ব-নির্ধারিত। পূর্ব-ঘোষিত। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। শেষ ঘণ্টা বাজার অপেক্ষা।

আমার শরীর ফুলে যাচ্ছে। সারা শরীর আর ঠিকভাবে রক্ত পাচ্ছে না। স্থানে স্থানে ব্যথা।

হৃদিতা আর ইদানীং ক্লাসে যাচ্ছে না। আমার পাশে পাশেই থাকছে। এখন আমাকে ওষুধ খাওয়াল।

একটা কমলার খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে এসে বসল আমার মাথার কাছে। বলল, 'খাবে?'

'দাও একটু।'

মুখে তুলে দিয়ে দিয়ে আমাকে খাওয়াচ্ছে। বিচি ছাড়িয়ে নিচ্ছে। আমি নিজের হাত দিয়ে ধরে যে খেতে পারতাম না, তা নয়। পারতাম। কিন্তু ওর এই আদরটা-যত্নটা আমি উপভোগ করছি। প্রাণভরে উপভোগ করছি। আর কদিন যে পারব, তা তো জানা নেই। হয়তো এই সকালটাই শেষ সকাল হবে। হয়তে আগামীকাল সকালটা দেখতে পাব।

বললাম, 'চলো একটু লনে যাই।'

'যাবে। চলো। হাঁটলে যদি একটু ভালো লাগে।'

আমাকে ধরে নিয়ে চলল হৃদিতা। বাইরে বাগানে। গার্ডেন চেয়ারে বসাল। বেশ শীত লাগছিল। এ জায়গাটায় একটু রোদ পাওয়া যাচ্ছে। আরাম লাগছে। আমি চোখ বন্ধ করে থাকি। পাখি ডাকছে, শুনতে পাই। আমাদের কামরাঙা গাছে এখনও টুনটুনি পাখি আসে। চড়ুই তো ঘরেই আসে।

লোরকার একটা কবিতা আছে। মৃত্যু ঘনিয়ে এলে ব্যালকনিটা সরিয়ে দেবেন দোহাই, ছেলেটা কমলালেবু খাচ্ছে, আমার বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। চাষী কাস্তে দিয়ে ফসল কাটছে। আমার বারান্দা থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। মৃত্যু ঘনিয়ে এলে ব্যালকনি সরিয়ে দেবেন। দোহাই আপনার।

আমারও এখন এ জীবনের জগতের নানা ক্ষুদ্র উপকরণকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। এই পাখির গান, এই লনে বসে শীতকালে রোদ পোহানো। এই কমলার সামান্য বিচি নিজের মুখ থেকে বের করে তুলে দেওয়া হৃদিতার হাতে।

হঠাৎ হৃদিতা সে উঠে বাগানের এক কোনে গিয়ে বসে পড়ল। মনে হচ্ছে, তার বমি হবে।

আমি বললাম, 'কী হলো? এই হৃদি তোমার কী হলো... মা মা।'

হৃদিতা বলল, 'না না কিছু হয় নি মাকে ডেকো না।'

দুলালি ছিল বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। সে দৌড়ে গিয়ে ডেকে আনল মাকে। মা এসে গিয়ে হৃদিতাকে ধরলেন।

'কী হয়েছে বউমা।'

'মাথা ঘুরে উঠল নাকি হঠাৎ। মা আমি ঠিক আছি। কিছু হয়নি।'

'মনে হয় রোদ লেগে মাথা ঘুরেছে। চলো বাসার ভেতরে চলো।'

'না না। আমি ঠিক আছি। এখানেই থাকি কিছুক্ষণ। দুলালি যাতো এক গ্লাস পানি আন।'

মা বললেন, 'আমার বাপু ভয় ভয় লাগে। তুমিও তোমার শরীরটা একবার থরো চেকআপ করিয়ে নাও তো।'

হৃদিতাকে ধরে তিনি বসিয়ে দিলেন আমার পাশের চেয়ারে।

আমি অসহায়বোধ করছি। ওর কিছু হলে তো আমি ওকে সাহায্যও করতে পারব না। বললাম, 'মা ঠিকই বলেছেন। তোমাকে একবার থরো চেকআপ করানো দরকার। ব্যাংককে করালেই হতো।'

হৃদিতা বললো, 'এত কিছু করাতে হবে না। পরিচিত ভালো গাইনির ডাক্তার থাকলে একটা এপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দাও। আজকে বিকালে যেতে হবে। কলাবাগানে ফোন করে দেব। মা এসে না হয় নিয়ে যাবে।'

'গাইনির ডাক্তার! কোনো প্রবলেম!'

'দুরো ছাই। বোঝোও না।'

'হৃদি, জান্, এটা কি সত্যি।'

'আগেই চিল্লাচিল্লি করার দরকার কী? ডাক্তারের কাছে গিয়ে টেস্ট করে আসি।'

উফ। আমার যে কী লাগছে! আমার প্রাণ খুলে হাসতে ইচ্ছে করছে। আমার গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। আমার চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে। আমার ইচ্ছা করছে লাফিয়ে নাচানাচি করতে।

হৃদিতাকে জড়িয়ে ধরলাম। এই খোলা আকাশের নিচে ওকে চুমু দিলাম। ও বলল, 'মাকে আগেই বলার দরকার কী? যদি না হয়!'

বিকালে ওর মায়ের সঙ্গে ও গেল ডাক্তারের কাছে। ফিরে এল সন্ধ্যায়। ওর মার সঙ্গে। ওর মা গলা চড়িয়ে ডাকলেন আমার মাকে, 'বিয়াইন সাহেবান, মিষ্টি খাওয়ান। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। ইনশাল্লাহ টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ।'

আমি এ-ঘর থেকে সব শুনতে পাচ্ছি। কল্পনা করতে পাচ্ছি আমার মা'র আনন্দটা কত তীব্র। সীমাহীন আনন্দের বন্যায় মা আমার ভাসছেন। আমাকে বিয়ে দেবার জন্যে তিনি যে অস্থির ছিলেন, সে তো এই জন্যেই। তার ঘরে একটা নাতি/নাতনী আসবে। তার বংশের ধারাটা ধরে রাখবে। আহা আমার জনমদুখিনী মা। ত্রিকূলে যেন কেউ নেই তার। আমি মরে গেলে আর কেউ থাকবে না। এখন তার একটা আশা অন্তত থাকল। আমার চোখ আবার ভিজে আসছে। খুশিতে। আনন্দে।

হৃদিতা এল। দরজা বন্ধ করে দিল। আমার বুকে এসে আশ্রয় নিল। বলল, শুনেছ, রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। আমি কনসিভ করেছি। ও আমার বুকে মুখ ঘষছে। আমি ওকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে লাগলাম। ওর গরম চোখের জল আমার বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে।

আমি বললাম, 'আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আজ আমার বড় খুশির দিন।

আমি জানি আমি ভালোবাসার পরীক্ষায় হেরে গেছি। তুমি জিতে গেছ। আমি জানি যে আসছে, সে হয়তো তার বাবার মুখ দেখতেও পাবে না। জানি না তার আর তোমার ভবিষ্যত কী হবে? তোমরা অনেক কষ্ট পাবে কিনা। আমি আন্তরিকভাবে দোয়া করি, তোমার আর তার জীবনটা সুখের হোক। টাকা পয়সার জন্যে ভেবো না। নগদ টাকাই আমি তোমার নামে রেখে দিয়েছি। জমিজমা আছে। ব্যবসা থাকবে। কিন্তু একা একা এ পৃথিবী চলা, আমার মা আমাকে নিয়েই পারে না। আর তুমি একটা শিশুকে নিয়ে কী করবে আল্লাহ জানে। তবে যখন আমার বাচ্চাটা বড় হবে, তার বোঝার বয়স হবে, তখন সে জানবে, সে এক গ্রেট মায়ের সন্তান। সে নিশ্চয় তার মায়ের স্যাক্রিফাইসটা বুঝবে। নিশ্চয়।'

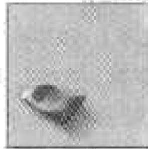
হৃদিতা মুখ তুলে বলল, 'না, তোমার মরা চলবে না। আমি তোমাকে মরতে দেব না। না কিছুতেই না।'

আমি জানতাম, একদিন এই সংকটের মুখে আমাদের পড়তেই হবে। আমি ধীরে ধীরে কবরের দিকে এগিয়ে যাব। আর হৃদিতা আমাকে সপাটে জড়িয়ে ধরতে চাইবে। আমিও। জীবন এক নাছোড় জিনিস। সে কিছুতেই তোমাকে ছাড়বে না। লোরকা ভেবেছেন, মৃত্যু ঘনিয়ে এলে ছেলেটার কমলা লেবু খাওয়া আর চাষীর ফসল কাটার দৃশ্য তাকে মায়ায় জড়িয়ে ধরবে। তিনি লোভাতুর দৃষ্টিতে জীবনের দিকে তাকাবেন। আর আমার কথা ভাবুন। আমার এই সর্বস্ব-বাজি-রেখে ভালোবাসার-খেলায়-নামা অল্প বয়সী রূপসী বউ আর অনাগত সন্তান ফেলে আমি কোথায় চলেছি?

এ জন্যেই তো আমি এসবের মধ্যে আসতে চাইনি।

আমরা দুজনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি। হিক্কা তুলে তুলে কাঁদছি। কাঁদছি আর চুমোয় চুমোয় মুছতে চাইছি অশ্রু। পরস্পরের।

ও ঘর থেকেও কান্নার শব্দ আসছে। সম্ভবত আমাদের দুই মা গলা জড়াজড়ি করে কাঁদছেন। তাদের ছেলেমেয়ের দুঃখময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে।



হৃদিতার কথা

আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার পেটের ভেতরে আমার প্রিয়তম মানুষটির সন্তান তার প্রাণ আর অস্তিত্ব ধরে আছে, আমি মা হতে যাচ্ছি, এ খবর নিশ্চিত হবার পর তার কাছে এসে, তার মুখ দেখে, তার স্পর্শ পেয়ে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আনন্দে। আবেগে। বেদনায়। হায়, যে সন্তান আসছে, সে কি তার বাবার মুখ দেখতে

পাবে। আর এই ভালো মানুষটি কি দেখে যেতে পারবে তার সন্তানের মুখ। আমি কিছু জানি না। আমি শুধু জানি শুধু কাঁদতে।

তারপর আমি ঠিক করলাম যে আমি আর কাঁদব না। এই পৃথিবীতে একজন মানুষ জন্ম নেবে, এর চেয়ে বড় আনন্দ-সংবাদ আর কী হতে পারে? এর চেয়ে বড় উৎসবের উপলক্ষ আর কী হতে পারে? আমাদের মনে শোক করবার নানা উপলক্ষ থাকতে পারে, কিন্তু বাচ্চাটার আগমনের গৌরব তাতে কমে না। আমি ঠিক করলাম, আমি হাসব।

কী আশ্চর্য, কবিরও ঠিক তাই ভাবছিল। সে আমাকে বলল, 'হৃদিতা, আমরা কাঁদলাম কেন? আমাদের সন্তানের আগমনের খবরে তো আমাদের উচিত আনন্দ করা। সেলিব্রেট করা। ওকে পেটে রেখে ওকে সামনে রেখে আমরা স্বার্থপরের মতো কান্নাকাটি করতে পারি না।'

আমি বললাম, 'আমি তো আনন্দে কেঁদেছি। তবে আর কাঁদব না। কিছুতেই না।'

ও আমার হাত ওর নিজের হাতে টেনে নিল।

দিন যাচ্ছে। কবিরের অবস্থা এখন শোচনীয়। কী টকটকে একটা মানুষ ছিল সে। এখন তার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে অনেক। এখন তাকে চেনাই যায় না, অবস্থা এমন। মুখটুখ ফুলে-ফেঁপে গেছে। তবে তার মনের জোর ঠিক আছে। আবার ব্যাংকক থেকে ঘুরে এসেছি। ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, আর কোনো আশা নাই। শুধু মৃত্যুর দিনটির জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া। ব্যাংককের হাসপাতালে চিকিৎসা আর সেবা দুটোই খুব ভালো পাওয়া যায়। নার্সরা এত আন্তরিকভাবে সেবাযত্ন করে যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। তারা রোগীদের গোসল করিয়ে দেয়, শেভ করিয়ে দেয়, পেশাব-পায়খানা, ড্রেসিং এ সব তো করবেই। তবু কবির বলল, চলো দেশে যাব। দেশের মাটিতেই মরা ভালো।

আমরা দেশে ফিরে এসেছি।

আমার দিক থেকে আমি চেষ্টার ত্রুটি রাখি নি। আল্লাহকে ডাকি। এমনকি মাজারে যাই। হজরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজার জিয়ারত করে এসেছি। বলেছি, হযরত, আমার কবিরের জন্যে দোয়া করুন। আল্লাহ যেন তার হায়াৎ বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ চাইলে কেন তার হায়াৎ বাড়বে না। হযরত, আমি ওর স্ত্রী সাক্ষী দিচ্ছি, ও খুব ভালো মানুষ। ও কারো কোনো ক্ষতি চায় না। এমনকি ও কোনোদিন কবুতরের মাংস খায় না। বলে, শান্তির প্রতীক? খাওয়া কি ঠিক? হযরত, এই পরিবারটা বড় দুঃখী। একজন মহিলা তার স্বামীকে হারিয়েছেন। তার বড় ছেলেকে হারিয়েছেন। তার শেষ ভরসাটিকে কেন আল্লাহ্ কেড়ে নেবেন। আপনার উসিলায় আল্লাহ যেন কবিরের হায়াৎ বাড়িয়ে দেন। ওর ভাইয়ের জীবন অসময়ে গেছে। তার আয়ু থেকে কবিরকে, হে আল্লাহ, আয়ু ভিক্ষা দেন। হজরত, আপনি দোয়া করুন, আমার আয়ু নিয়ে যেন আমার কবিরের আয়ু বাড়িয়ে দেন আল্লাহ। হযরত, ওর বাচ্চা আমার পেটে, অন্তত ও যেন ওর সন্তানের মুখটা দেখতে পায়।

আমার পেটে বাচ্চা আসার ৫ মাস হয়ে গেছে। ও প্রায়ই আমার পেটে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে ভেতরের নড়াচড়া টের পাওয়া যায় কিনা।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে আগের চেয়ে যেন একটু ভালো। আমাকে ডেকে বলল, 'হৃদি আমাকে একটু বসাও।' ওকে ধরে বিছানায় বসালাম।

ও বলল, 'আজকে একটু হাল্কা লাগছে।'

ওকে বললাম, 'হার্ট ফাউন্ডেশনে একটা সুইডিশ টিম আসছে। সামনের সপ্তাহে। তোমার নাম এন্ট্রি করে দিয়েছি।'

ও হাসল।

আমি বললাম, 'কালকে মনিভাইজান বলছিলেন, ইন্টারনেটে দেখেছেন, কার্ডিওমায়োপ্যাথি এখন ভালো হয়। ট্রিটমেন্ট বেরুচ্ছে। রিসার্চ তো কম হচ্ছে না। টিস্যুগুলো নাকি আবার একটিভেট করা যায়।'

সে হাসল। আস্তে আস্তে বলল, 'আমি এত তাড়াতাড়ি তোমাদের সাফারিং কমাচ্ছি না। আমি আছি। আমার মেয়ে হবে। তার মুখ দেখে তারপর... ভেবে দেখব, যাব, নাকি যাব না।'

'যদি ছেলে হয়?'

'জানি না। আল্লাহ্ যা দেন।'

'নাম কী রাখব?'

'আমি একটা ভেবেছি।' ও যেন নাম বলতে লজ্জা পাচ্ছে।

'বলো।'

'প্রীতি।'

'ভালো। খুব সুন্দর নাম।'

ওর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। বলল, 'প্রীতি তো উঠে যাচ্ছে দেশ থেকে, আমার মেয়ে প্রীতি হয়ে আসবে।'

আমার অন্তরটা হাহাকার করে উঠল। এই লোক এত অসুস্থতার মধ্যেও এভাবে ভাবে। দেশের কথা। মানুষের কথা। খবরের কাগজে ক'দিন সংখ্যালঘু নিপীড়নের খবর পড়ে ও খুবই দুঃখ পেয়েছে। ইদানীং তাই আমি ওকে আর খবরের কাগজ পড়তেই দেই না।

ও বলল, 'জানালাটা খুলে দাও।'

স্লাইডিং জানালা। খুলে দিলাম। নেট-দেওয়া জানালাটাও।

বর্ষাকাল। জানালার বাইরে মনে হয় বেলি ফুল ফুটেছে। মিষ্টি গন্ধ আসছে। ঘরে মৃদু আলো। বাইরে বিদ্যুৎ চমকালো। বিছানার পাশে বসে আমি ওর হাত ধরে রইলাম।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হলো। ও বলল, 'একটা কথা বলি? লজ্জার কথা।'

'বলো।'

'আমার মনে হচ্ছে আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি।'

আমি চোখের জল গোপন করে হেসে বললাম, 'মনে হচ্ছে কী? তুমি তো সেরে উঠবেই। সুইডিশ টিম নিশ্চয় লেটেস্ট মেডিক্যাল ফ্যাসিলিটি নিয়ে আসবে। তুমি ভালো হবে। আবার ছবি আঁকবে। তোমার ওই যে রূপসী বাংলা-র সিরিজটা শেষ করবে।'

ওর চোখ চকচক করে উঠল। বলল, 'আইডিয়াটা ভালো না? শঙ্খচিল, ধানশালিখ, বেহুলা, লখিন্দর, বিম্বিসার, অশোক... আর তুমি?'

বললাম, 'খুব ভালো আইডিয়া। তোমার ছবি আঁকা হয়ে গেলে আমরা বড় একটা এক্‌জিবিশন করব। অনেক বড়। শিল্পকলায়।'

ও বলল, 'সিরিজটার নাম দেব কী জানো?'

'কী?'

'আবার আসিব ফিরে।'

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল কবিরের ডাকে। ও বলল, 'হৃদি, হৃদি।'

অনেক বড় একটা খাটে আমরা দুজন শুই। আমি জেগে উঠলাম, বললাম, 'কী জান্।'

ও বলল, কাছে আসো। গেলাম। ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে চাইল। বলতে পারল না। নীরব হয়ে গেল। আমি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'জান, কিছু বলবে?'

ও কোনো কথা বলছে না। ওর দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। আমার চোখ ফেটে আসছে কান্নার চাপে। কিন্তু আমি কাঁদব না। আমি কাঁদব না।

আমি বললাম, 'আমি হাসছি, কবির, জান, দেখো, আমি তোমাকে পেয়ে আসলেই ভীষণ সুখী হয়েছি। তুমি শান্তিতে ঘুম দাও।'

ও আমার হাত ওর কপালে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করল।

পাশের ঘরে নার্স ঘুমাচ্ছিল। দরজা খোলা থাকে। আমি বললাম, 'সিস্টার, মাকে ডাকেন। মনে হয় আর সময় নাই।'

সিস্টার মাকে ডেকে আনল।

ততক্ষণে তার শ্বাস উঠে গেছে। সিস্টার তার বিদ্যামতো শেষ-দাওয়াই দিল। একটা ইনজেকশন।

আমি মনে মনে বলছি, হে আল্লাহ, হযরত শাহজালালের দরবারে তোমাকে যা বলেছি, রহমত করো, ওকে অন্তত আমার ডেলিভারি পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখো। হে আল্লাহ্ আমি ওর ধর্মপত্নী সাক্ষী দিচ্ছি, ও খুব ভালো। ও কবুতরের মাংসও খায় না। ও ওর মেয়ের নাম প্রীতি রাখতে চায়, কারণ দেশ থেকে প্রীতি উঠে যাচ্ছে...

মা কাঁদছেন। বললেন, 'হাসপাতালে নেব। ফোন করি।'

'করেন।' জরুরি নম্বর সব লেখা আছে। তিনি ফোন করতে গেলেন।

আমি কবিরের কব্জি ধরে আছি। এখনও নাড়ি আছে। আস্তে আস্তে, তুষার আগুনের মতো, নাড়ি নিভে যাচ্ছে যেন।

মা ছুটে এলেন। বললেন, 'এম্বুলেন্স আসছে।'

জানালার কাচটা এখনও সরানো। ফাঁক দিয়ে বাইরের পৃথিবীর ভোর হওয়া দেখা যাচ্ছে। একটা বিবর্ণ চাঁদও আছে ভোরের আকাশে।

ঠিক জানালার কাছে কামিনী গাছের ডালটা বৃষ্টিস্নাত ভোরের হাওয়ায় একটু একটু করে দুলছে। বাইরে বেলি ফুলের ঝাড়ে ফুল ফোটার কথা। গতকাল সন্ধ্যায়ও বেলি ফুলের ভারি মিষ্টি গন্ধ এসেছিল জানালা দিয়ে।

কিন্তু বেলি ফুলের নয়, গোলাপ ফুলের একটা মধুর ভেজা গন্ধ আসছে। আজ বাগানে কি গোলাপ ফুটেছে?

মা উঠে গিয়ে আগরবাতি জ্বালিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত পুরো ঘরটা গোলাপের গন্ধে ভরে রইল।

আর আমরা তিনজন বিভিন্ন বয়সী নারী, বসে রইলাম, চুপচাপ। মা আমার হাত ধরে রইলেন।